উইং কমাণ্ডার

উইং*কমাণ্ডার

নিমাই ভট্টাচার্য

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জুন
১৯৬১

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উইং কমাণ্ডার

॥ এক ॥

আকাশ দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে, বিস্মিত হয়ে দেখে কত ছেলেমেয়ে। ছোটবেলায়, কৈশোরে।

পক্ষীরাজ ঘোড়ার রথে চড়ে যারা আকাশ-পাতাল স্বর্গ-মর্ত ঘুরে বেড়ায়, যারা এই মাটির পৃথিবীতে বাস করেও তার রুক্ষতা দেখেনি, যারা সবে পথ চলতে শুরু করেছে এখনও হোঁচট খায়নি, তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল পাখির ঝাঁক।

অলীক, অবাস্তব, অসম্ভবকে স্বপ্ন দেখে সব শিশু, সব কিশোর। ছোটবেলায় রেল-এঞ্জিন দেখে সবাই ড্রাইভার হতে চায়।

বহুদিন মনে পড়েনি এসব কথা। বহু বছর। স্কুল কলেজেও মনে পড়েনি, মনে পড়েনি ডেরাডুন ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীর ক্যাডেট তপন সরকারের। এমন কি শেষ দিনটিতেও না। জয়েণ্ট সার্ভিসেস উইং-এর পাসিং আউট প্যারেডের দিনেও না।

মাটির পৃথিবীতে বাস করে ঐ দূরের সীমাহীন রহস্যভরা আকাশের সঙ্গে এত গভীর, গাঢ় সম্পর্ক হবে, ভাবতে পারেনি। ভাববে কেমন করে? মাটির পৃথিবী নিয়েই মত্ত থাকতে দেখেছে সবাইকে। আশেপাশের সবাইকে। জানা-অজানা সবাইকে। ঐ দূরের আকাশের সঙ্গে মিতালী করার অবকাশ কোথায়। দিগন্তবিস্তৃত মহাকাশের মহারূপের খেলা দেখার মন কোথায়?

শৈশবে কৈশোরে, এমন কি যৌবনের উদ্বোধনী মুহূর্তেও তপন ভাবতে পারেনি আকাশের কোলেই ওর সারাজীবন বিচরণ করতে হবে। ভাবতে পারেনি চিরপ্রিয়া প্রাণ প্রেয়সীর অভিমানী রাঙা মুখখানির মত অজানা অজ্ঞাত মহাকাশের রং বদলের খেলার ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে হবে ওকে।

দুটি বছর ডেরাডুনে কাটাবার পর যোধপুরে নাম্বার টু এয়ার ফোর্স একাডেমীতে এসেই যেন প্রথম আকাশ দেখল তপন। ভাল করে দেখল। খুব ভাল করে। সমস্ত প্রাণ, মন, সত্ত্বা দিয়ে। অর্জুন গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে দ্রৌপদী লাভের জন্য লক্ষ্যভেদ করার সময় সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে যেমন শুধু মাছের চোখ দেখেছিলেন, তপন প্রায় তেমনি করেই দেখল ঐ দূরের নীল আকাশকে। দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে। গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ বসন্তে ঐ মহাকাশের আশ্রয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে? উড়ে বেড়াতে হবে? কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক যাকে দূর থেকে বন্দনা করেছে, মনের মাধুরী দিয়ে রং

মাখিয়েছে, পাখির মত ডানায় ভর দিয়ে সেই আকাশের সঙ্গে মিতালী করতে হবে? সংসার পাততে হবে?

অতীত দিনের মহারাজার ঐ নাতিদীর্ঘ রাণওয়ের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আরো কত কি ভাবছিল। তপন কবি নয়, ভাবুক নয়, শিল্পী-সাহিত্যিকও নয়। তবুও মনে হলো, জীবনটাই একটা সীমাহীন রহস্যভরা মহাকাশ। এর আদি নেই, অন্ত নেই। যেখানেই শেষ, সেখানেই শুরু। মানুষের জীবনের মত আকাশে ঝড় ওঠে, দাপাদাপি, মাতলামী, পাগলামী করে। আলোয়-হাসিতে ঝলমল করে ওঠে, দুঃখে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়, ভাসিয়ে দেয় বসন্তের শেষ পরিচয়। মানুষের মত আকাশেরও শৈশব-কৈশোর যৌবন বার্ধক্য আছে। তাই তো পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ নিয়ে সে কখনো খেলা করে, লুকোচুরি করে, উড়ে বেড়ায়, ছুটে বেড়ায়। যৌবনের ললাট-টীকা সূর্যকে বুকে করে মধ্যাহ্নে তটস্থ করে সমস্ত বিশ্বকে। আবার বসন্ত বিদায় বেলায়, সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় ম্রিয়মান হয়ে মহাকালের কাছে আত্মসমর্পণ করে বার্ধক্যকে বরণ করে।

রাণওয়ের একদিকে রত্নাডা প্যালেস, অন্যদিকে চিত্রা প্যালেস। ঐ দুটি প্রাসাদের মাঝখানের সমস্ত আকাশ জুড়ে তপন যেন নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। নিজের দেহের অণু-পরমাণুকে পর্যন্ত মানুষ যেমন ভালবাসে, ঐ বিস্তীর্ণ আকাশের সব কিছুকেই তেমনি ভালবাসল তপন সরকার। ফ্লাইট ক্যাডেট তপন সরকার।

যোধপুরকেও যেন ভাল লাগল।

কলকাতা ছেড়ে ডেরাডুন যাবার সময় ভীষণ মন খারাপ লেগেছিল। পরে ভালই লেগেছিল। দুটি বছর ডেরাডুনে কাটিয়ে যোধপুর আসার পর প্রথম কদিন অসহ্য মনে হচ্ছিল। নেই সবুজ-শ্যামলের স্পর্শ, নেই খরস্রোতা পাহাড়ে নদী, নেই দূরের হিমালয়ের হাতছানি। ভাল লাগবে কেন যোধপুরকে? রাতের অন্ধকারে কি ঐ দূরের মুসৌরী পাহাড়ের আলোর মালা দেখা যায়? না।

প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল যোধপুরের একটা ঐতিহ্য আছে, ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার উল্লেখ আছে। ডেরাডুনের সে ইতিহাস, ঐতিহ্য কোথায়? কিছু সংস্কৃত পুঁথিতে নাকি উল্লেখ আছে শিবের আস্তানা কেদারখণ্ডের এক অংশ আজকের ডেরাডুন। রাম আর পঞ্চ পাণ্ডবের পাদস্পর্শেও নাকি ডেরাডুন ধন্য হয়েছে। কিন্তু আজকের মানুষের কাছে তার কি মূল্য? কি তাৎপর্য? তাছাড়া ক'জনই বা জানে এসব? সমস্ত বাঙালীর কাছে সমগ্র মাড়বারের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। আজকের মত অতীতের মাড়বারের মানুষের মন মানুষেরই রক্ত শোষণ করে সোনা-চাঁদি দিয়ে বাক্স-পেটরা ভর্তি করতে জানত না। বাঙালীর মতনই মাড়বারের মানুষ বার বার বহুবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। দেশের কল্যাণ, জাতির মঙ্গল, নারীর সম্মান রক্ষার জন্য মাড়বারের

লক্ষ লক্ষ মানুষ হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বামীর মৃতদেহ ফিরে এলে স্ত্রী শোকে মুর্ছা যায়নি, সিঁথির সিঁদুরে স্বামীর রক্ত তিলক পরে সে তলোয়ার হাতে নিয়েছে। সেই পুণ্যভূমির অন্যতম রত্ন যোধপুরকে ভালবাসবে না তপন ?

জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্র যোধপুরকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নতুন করে উপলব্ধি করল ফ্লাইট ক্যাডেট সরকার। সুদূর অতীত থেকে বর্তমানের সব কিছু স্মৃতির মধ্যেই কত কীর্তি-কাহিনীর স্পর্শ অনুভব করে। একটা চাপা আনন্দ, উত্তেজনা ও রহস্যের নেশায় বিভোর থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।

কে. কে. মজুমদার ব্লকের দোতলার ঐ ছোট্ট ঘরে শুয়ে শুয়ে মেসের চৌকিদার যুধিবীর সিং-এর কাছে গল্প শোনে তপন।...'আরে সাব' কি আর বলব ? আওরঙ্গজেব আউর মুরাদ যদি কারুর কাছে উচিত শিক্ষা পেয়ে থাকে তো সে হামারা মহারাজা যশোবন্ত সিং-এর কাছে।...

চৌকিদার যুধিবীর সিং-এর কথা শুনে উঠে বসে তপন। চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করে, কেন ?

বাসন্তী রঙের পাগড়ীটাকে ঠিক করে নিয়ে যুধিবীর একটু মুচকি হাসে। সে হাসিতে বিদ্রুপের স্পষ্ট ছাপ। যেন আওরঙ্গজেব আর মুরাদকেই উপহাস করার জন্য যুধিবীর সিং অমন মুচকি হাসল।

'শয়তান আওরঙ্গজেবকে শিক্ষা দেবার জনাই মহারাজা শাজাহানের সেনা-বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।'

আবার একটু মুচকি হাসি।

'মহারাজা অজিত সিং তো মাড়বার থেকে মোগলদের একেবারেই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

যোধপুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে গেলেই তপনের চোখ দুটোকে বার বার টেনে নেয় দক্ষিণের ঐ স্যান্ডস্টোন পাহাড়। সন্ধ্যার আবছা আলোয় যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পায় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় মাড়বার বাহিনীর বিজয় উল্লাস। এসব আরো বেশী মনে পড়ে ফোর্ট দেখতে গিয়ে। বিজয় তোরণের মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। আর শেষ লোহা গেটে পনেরটি সতীর হাতের ছাপ দেখে চমকে উঠেছিল তপন সরকার!

সতী ?

মহারাজাদের মৃত্যুর পর যে পনেরো জন মহারানী স্বামীর শোকে সহমরণ বরণ করেছিলেন, সেই তাঁদেরই শেষ চিহ্ন!

কলকাতার তপন সরকার এসব দেখে চমকে উঠবে না ?

জুয়েল হাউসে গিয়ে মনটা একটু স্বাভাবিক হয়েছিল কিন্তু একটু পরেই সাড়ে চারশ' ফুট গভীর কূপ দেখে আরেকবার চমকে উঠল।

ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের কনিষ্ঠতম অফিসার ফ্লাইট ক্যাডেট তপন সরকার

মেসে শুয়ে শুয়েও কি কম রোমাঞ্চিত হয় ? এয়ার ফোর্সের প্রথম যুগের দুটি রত্ন করুণাকৃষ্ণ মজুমদার ও রঙ্গনাথের নামে দুটি মেস। করুণাকৃষ্ণ মজুমদার বাংলাদেশের 'দার্জিলিং' এর ছেলে। নিজের কৃতিত্বে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের অনেক এয়ার কমোডর এয়ার ভাইস মার্শালকেও চমকে দিয়েছিলেন। নর্থ ওয়েস্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার প্রভিন্সে মারা যাবার পর কত বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও অম্লান তাঁর স্মৃতি।

সেই কে. কে. মজুমদার ব্লকের দোতলার ঘরে শুয়ে শুয়েও তরুণ অফিসার তপন শিহরন অনুভব করে মনে মনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফার ইস্ট থিয়েটারে ইংরেজ আর এ্যালায়েড ফোর্স যখন জাপানীদের হাতে এক তরফা পিটুনি খাচ্ছিল, বিলেত থেকে ট্রেনিং দিয়ে নতুন পাইলট আমদানী করার আর সময় ছিল না, তখন ইণ্ডিয়ান পাইলটদের ট্রেনিং দেবার জন্যই যোধপুরে এয়ার ফোর্স এলিমেণ্টারী ফ্লাইং ট্রেনিং স্কুল খোলা হয়। তদানীন্তন যোধপুর মহারাজা উমাইদ সিং বিপন্ন ইংরেজকে দান করলেন নিজের প্রাইভেট এয়ার ফিল্ড। মহারাজা উমাইদ সিং-এর পুত্র মহারাজা হনমন্ত সিং একজন নামকরা ফ্লায়ার ছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি এই এয়ারফিল্ডের পাশেই এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। বোম্বের এক সুন্দরী যুবতী ফিল্মের অভিনেত্রীও নাকি ঐ বিমানেই বিমান চালান শিখ্‌ছিলেন। যুধিবীর সিং-এর মত রাজভক্ত প্রজারা এ কাহিনী জানলেও বলে না, স্বীকার করে না। এয়ার ফোর্স মেসের আড্ডাখানায় শোনা যায় ঐ রোমাণ্টিক মহারাজার মৃত্যুর পর যোধপুরের সমস্ত পুরুষ মস্তক মুণ্ডন করে-ছিলেন।

এসব কাহিনী শুনে তপন মুচকি হাসে।

সারাটা দিন নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠতে হয় ও এক ঘণ্টার মধ্যে এয়ার ফিল্ডে ব্রিফিং রুমে ইন্সট্রাক-টারের ব্রিফিং শুনতে হাজির হতে হয়। ব্রিফিং শেষ হবার পর ও সূর্য ওঠার কুড়ি মিনিট আগে ফাস্ট লাইট দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এয়ারক্রাফট্ এর ইঞ্জিন চালু করে ঐ দূরের নীল আকাশের কোলে ভাসতে হবে।

একটা-দুটো সর্টি উড়ার পর টি ক্লাবে ব্রেক ফাস্ট। দুটো আণ্ডা, দুটো রুটি, পরিচ এ্যাণ্ড মিল্ক. টি অর্ কফি। তারপর পুরো সিগারেটটা খাবারও অবকাশ নেই।

আবার ইঞ্জিন স্টার্ট করে ফ্লাইং। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে সর্টি।

লাস্ট সর্টি শেষ করে দূর থেকে উড়তে উড়তে এসে চিত্রা প্যালেসের মাথার উপরে এলেই এয়ার ক্রাফট ঘুরাতে হতো ল্যাণ্ডিং-এর জন্য। তাইতো দূরের আকাশে ভেসে বেড়াতে বেড়াতেও চিত্রা প্যালেসকে ভুলত না কেউ। সীমা-হীন মহাকাশের কোলে যারা উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াত, তাদের জন্য সো নালী

পৃথিবীর আমন্ত্রণলিপি তুলে ধরত এই চিত্রা প্যালেস ! লাস্ট সর্টির ঐ শেষ মুহূর্ত ক'টি একটি চাপা মিষ্টি উত্তেজনা অনুভব করত সবাই। চিত্রা প্যালেসের হাতছানি যেন বিভোর করে তুলতো সবাইকে।

এক ঘণ্টা মাত্র লাঞ্চ। তারপর আবার ক্লাশ, আবার ফ্লাইং।

একটা-দুটো সর্টি ফ্লাইং, এর মাঝে হয়ত বা দু'চার মিনিটের জন্য টি ক্লাবে হাসি-ঠাট্টা আর এক কাপ চা বা কফি।

গরমের দিনে লাঞ্চের পর ছুটি। বিকেলের দিকে খেলাধুলো। রাইডিং, সুইমিং, হকি, ফুটবল, ভলিবল থেকে হা-ডু-ডু পর্যন্ত। নেই বিলিয়ার্ড। ওটা শুধু অফিসারদের জন্য।

ছুটির দিনে দল বেঁধে শহর যাওয়া। সিনেমা দেখা, রেস্তোরাঁয় খাওয়া ! রাস্তাঘাটে পদ্মিনীর উত্তরসাধিকাদের দেখে ঈষৎ চাঞ্চল্য। একটু হাসি, একটু ইসারা। হয়ত বা একটু রোমাঞ্চ।

আরো কত কি। কোন ছুটির দিনে হয়ত পদম্ সাগর বা রাণী সাগরের পাড়ে বসে বসে খোস গল্প। কোরাস গান। অথবা নববিবাহিত ইন্সট্রাকটার স্কোয়াড্রন লীডার মাথুর ও মিসেস মাথুরকে নিয়ে একটু রসালাপ।

'ইফ আই গেট এ্যান অপরচুনিটি, আই মাস্ট ডান্স উইথ হার ওয়ান নাইট।'

নববিবাহিতা অঞ্জলি মাথুরকে নিয়ে আরো কত আলোচনা, কত স্বপ্ন।

'আই উইস অঞ্জলি মাথুরকে নিয়ে যদি প্লেন ক্রাশে এক সঙ্গে মরতে পারতাম··· ।'

কেউ লুকিয়ে, কেউ প্রকাশ্যেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত।

সেসব দিন কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজও অঞ্জলি মাথুরকে নিয়ে কত আলোচনা। অফিসার্স মেসে ককটেল্-ডিনারের রাতে কত মৌমাছি ঘুরে বেড়ায় তাঁর চারপাশে।

কোন অজ্ঞাত অজানা দিগন্ত থেকে উড়ে আসে বাতাস। বঙ্গোপসাগর থেকে সে সংগ্রহ করে জলীয় বাষ্প। বর্ষা নামে গাঙ্গেয় উপত্যকায়। তিব্বতের হাওয়া তুষারমৌলী হিমালয় স্পর্শ করে ঠাণ্ডা করে সমগ্র উত্তর-মধ্য ভারত।

ভাবতেও বিচিত্র লাগে ! সারা বিশ্ব-সংসারই এমনি রসিকতায় ভরা। হিমালয় নাকি সর্বকনিষ্ঠ পর্বত আর বিলীয়মান আরাবলী বুঝি পর্বতকুলের দাদু !

চমৎকার।

কোন কিছুরই যেন কোন হিসাব-নিকাশ নেই। অঞ্জলি মাথুরকে নিয়ে যোধপুরে লুকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত যারা, তারাই আজ নায়ক। উপনায়ক।

পদম সাগর বা রাণী সাগরের পাড়ে বসে আড্ডা দিতে দিতে অলীক অবাস্তব

স্বপ্ন দেখে খুশী হতে পারেনি জর্জ আর নায়ার। শুরু করল সিনিয়র ইন্সট্রাকটারের কোয়ার্টারে যাতায়াত।

'আই হোপ, ইউ ডোণ্ট মাইন্ড স্যার! বড্ড একলা একলা লাগে। মাঝে মাঝে ভাবীজির কাছে এসে উই উইল টেস্ট সাম নিউ প্রিপারেশনস!'

গোবেচারীর মত কথাগুলো বল্লো জর্জ।

সিনিয়র ইন্সট্রাকটার জর্জের কাঁধে দু'বার ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লেন, রিমেমবার মৃণালিনীর সংসার শুধু তার স্বামী আর দুটি সন্তানকে নিয়েই নয়, তোমাদের সবাইকে নিয়েই তাঁর সংসার।

বড় খুশী হলো জর্জ আর নায়ার।

সত্যি খুশী হবার মতই কথা। রেগুলার এয়ার ফোর্স স্টেশনে একটা চরিত্র আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। আছে মোহ, উত্তেজনা। আছে একটা আট-সাট বাঁধুনী। যোধপুর এয়ার ফোর্স একাডেমীর সেসব কিছুই নেই। এর প্রাণ আছে কিন্তু প্রাণ চাঞ্চল্য নেই, হৃদয় আছে কিন্তু তার স্পন্দন শোনা যায় না। অহরহ একটা নিঃসঙ্গতার বেদনা অনেককেই পীড়া দেয়। জর্জ—নায়ারকেও।

সিনিয়র ইন্সট্রাকটার ও তাঁর স্ত্রী মৃণালিনীও একথা জানেন। তাছাড়া থানার দারোগার মত এয়ার ফোর্সের অফিসাররা শুধু নিজেদের নিয়ে মগ্ন থাকতে জানেন না।

মিসেস্ মৃণালিনী স্বামীনাথন এগিয়ে এসে বল্লেন, যখন খুশী চলে আসবে। আর কিছু না হোক, হাসি মুখে এক কাপ কফি দেব নিশ্চয়ই।

মৃণালিনী-গৃহে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় অফিসারদের আড্ডা জমত, একথা সব ফ্লাইট ক্যাডেটই জানত। শুধু আড্ডা নয়, খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টা গান-বাজনা আরো কত কি!

স্বামীনাথনের দুটি ছেলে ছুটিতে এসেছে। পিছনের টেনিস কোর্টে ব্যাড-মিন্টন খেলা শুরু করেছে। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা।

দুই ভাই-এর এই ব্যাডমিন্টন খেলা হঠাৎ কৌলীন্য লাভ করল। একদিন র‍্যাকেট তুলে নিলেন অঞ্জলি মাথুর। দলে টেনে নিলেন আরও দু'একজনকে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ফ্লাড লাইটের আলোয় এদের ব্যাডমিন্টন খেলা যেন মধু বসন্তের ইঙ্গিত আনল ফ্লাইট ক্যাডেটদের মধ্যে। আরও একটু চঞ্চল হলো জর্জ আর নায়ার।

চারপাশ অন্ধকার। মাঝখানে আলোয় ভরা ঐ ছোট্ট ব্যাডমিন্টন কোর্ট। কিন্তু ফ্লাড লাইটগুলোকেও যেন ম্লান করে দেয় মিসেস অঞ্জলি মাথুর।

'তাই না নায়ার?'

নায়ার ও-কথার জবাব দেয় না, দেবার প্রয়োজন বোধ করে না।

একদিন এই ব্যাডমিন্টন কোর্টেই স্বামীনাথনের বড় ছেলে গোপাল আলাপ করিয়ে দেয়, আণ্ট, আপনার সঙ্গে এই আংকেলদের পরিচয় নেই?

'সরি গোপাল, আমার সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি।'

'আই এ্যাম ফ্লাইট ক্যাডেট জর্জ আর ও হচ্ছে ফ্লাইট ক্যাডেট নায়ার।'

চীফ ইন্সট্রাকটার স্বামীনাথনের ড্রইংরুমে অফিসারদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সুযোগ ছিল না কিন্তু গোপালের ব্যাডমিণ্টন কোর্টে আসা-যাওয়ার বাধা ছিল না। তাই তো শুধু মিসেস মাথুর নয়, আরো অনেকের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠতা হলো।

ফ্লাইট লেফ্‌ট্‌নাণ্ট সরকার বলতেন, খেলার জন্যই খেলবে। আমাকে হারাবার চেষ্টা করো না নায়ার!

গেস্টদের ড্রিংক সার্ভ করার পর সময় পেলেই চলে আসতেন এই ব্যাডমিণ্টন খেলার আসরে। 'অঞ্জলি, তুমি আর সরকার ওদিকে যাও। আমি আর নায়ার এদিকে আছি।'

অঞ্জলি প্রতিবাদ করে। সরকার সাহেবের চাইতে বরং আমার হাসব্যাণ্ডকে দাও। তা'হলে নীল'-এ গেম যাবে। তাতে সান্ত্বনা আছে কিন্তু সরকারকে নিয়ে খেললে দু'এক পয়েণ্ট হতেও পারে।

সবাই হাসে। মিসেস স্বামীনাথনও হাসতে হাসতে বলেন, আবার যদি স্বামীর নিন্দা করেছ তা'হলে ভীষণ বকুনি খাবে।

যোধপুর বাসের মেয়াদ একটি বছর। ওরা এসেছিল জুলাইতে। গরমের শেষে। তখন দু'বেলা ফ্লাইং ছিল, ক্লাশ ছিল। সারাদিনের ক্লান্তির পর সন্ধ্যার আমেজ, রাত্রির মদিরতা অনুভবের অবকাশ পেত না। শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্ত কেমন করে ফুরিয়ে গেল, কেউ টের পেল না।

ফিরে এসেছে গ্রীষ্ম। নিদারুণ প্রাণহীন গ্রীষ্ম। যোধপুরের লাল বালি যেন রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন শুধু সকালেই ফ্লাইং। তারপর ক্লাশ। লাঞ্চের আগেই সব শেষ। মেসে ফিরে ইউনিফর্ম ছেড়ে, ওয়াশ করে, ডাইনিং রুমে গিয়ে গল্পগুজব করতে করতে লাঞ্চ শেষ করতেই প্রায় তিনটে বাজে।

তার পরের সময় আর কাটতে চায় না। দু'চারজন ঘুমোয় কিন্তু অধি-কাংশই গরমে ছটফট করে। তাস খেলে, গল্প করে, আড্ডা দিয়েও শান্তি পায় না। দু'একজন আবার মাঝে মাঝে চিৎকার করে যারা মেস কাঁপিয়ে দু'চার কলি গান করে।

চতুর্বেদী আরো জ্বালা বাড়ায়। 'ইম্যাজিন ইন্সট্রাকটার মাথুর! রাজার ঐ ছোট গেস্ট হাউসে খসখসে মোড়া ঘরে··· ··

কেবল সিং প্রতিবাদ করে, ডোণ্ট-এ্যাড ফুয়েল টু দি ফায়ার।

হাজার হোক বেনারসের রসিক। চতুর্বেদী থামে না, ধবধবে বিছানায় ··

দু' চারজন চিৎকার করে দাবী জানায় তারপর? তারপর?

চতুর্বেদী আরো জোরে চীৎকার করে, মার্ডার। মার্ডার। মার্ডার।

মিসেস মাথুরের রূপ-লাবণ্যের তারিফ করত তপন কিন্তু ঠিক ঐসব আলো-

চনায় যোগ দিতে পারত না। চাইত না। দ্বিধা হতো, সংকোচ লাগত। আবার বন্ধুদের রসালাপ উপভোগ না করেও পারত না।

বাংলার বাইরে বাঙালী মাত্রেই দাদা। তপনও দাদা।

চতুর্বেদীর কথায় সবাই হো হো করে হাসছিল। হাসি থামিয়ে নায়ার তপনের দিকে ফিরে বল্লো, আচ্ছা দাদা তুমিই বলো ইজ সী নট এ পোয়েম লাইক মোস্ট বেঙ্গলী গার্লস ?

বাঙালী মেয়েদের স্নিগ্ধ লাবণ্য থাকলেও সবাই যে কবিতা নয় তা তপন জানে কিন্তু অবাঙালীরা বাঙালী মেয়েদের মর্তের স্বপ্ন বলেই জানে। তপন কি বলবে ? একটু হাসল।

উত্তেজিত চতুর্বেদী চিৎকার করে বল্লো, বলো বলো দাদা, তুমিই বলো।

তপন আবার হাসল। একটু স্পষ্ট করে হাসল। নারী সৌন্দর্যের বিচারকের ভূমিকায় নিজেকে আবিষ্কার করে হাসি আরও স্পষ্ট হলো।

জর্জ বল্লো কাম অন। হারি আপ।

তপন কয়েকবার এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল। পারল না। শেষে বলতে বাধ্য হলো, মিসেস মাথুর ঠিক পোয়েম নয় বাট সী ইজ এ সনেট।

কেউ চিৎকার করল লাভলি, লাভলি ; কেউ জানতে চাইল হোয়াই হোয়াই ?

ছন্দ আছে ; মাধুর্য আছে, রস আছে অথচ একটু যেন ···

আবার চিৎকার। 'হোয়াট, হোয়াট ?'

একটু যেন ভাঙা ভাঙা। কোথাও দীর্ঘ কোথাও হ্রস্ব ; কোথাও যেন একটু উদ্ধত, কোথাও যেন একটু বে-হিসেবীভাবে অবনত······

তপনকে আর এগুতে হয় না। জর্জ চিৎকার করে, থ্রি চিয়ার্স ফর তুফান সরকার।

দুপুরের নিঃস্তব্ধ যোধপুরকে কাঁপিয়ে দেয় ওদের উচ্ছ্বাস, উল্লাস।

অনেক দিন কেটে গেছে কিন্তু সেদিনের স্মৃতি ওরা কেউ ভোলেনি। ভুলবে কেমন করে ? অঞ্জলি মাথুরের নতুন নামকরণের দিন কি ওরা ভুলতে পারে ?

বেশ কয়েক বছর পরের কথা। তপন ওরফে তুফান সরকার তখন পুনায় পোস্টেড। আদমপুর থেকে চতুর্বেদীর চিঠি পেল। ·····মাথুরকে তো তুমি ভালভাবেই চেন। নিছক শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। হওয়া উচিত ছিল স্কুল মাস্টার নয়ত ছোটখাট কলেজের লেকচারার। কিন্তু 'সনেট' যেন সিন্ধু নদী। উদ্দাম তার গতি, সারা বিশ্বসংসার যেন তার বিচরণ ক্ষেত্র! মাথুর যেন বসন্তের মিষ্টি হাওয়া আর 'সনেট' ? কালবৈশাখী। নরওয়েস্টার।

নরওয়েস্টারের মত 'সনেটের' দৈন্য নেই, মালিন্য নেই। আরো অনেক গুণ আছে মেয়েটার। রাতের অন্ধকারে চোরের মত চুপি চুপি কালবৈশাখী আসতে

জানে না। প্রকাশ্য দিবালোকেই কর্মচঞ্চল দুনিয়াকে, সমাজকে সে স্তব্ধ করে।……

দীর্ঘ চিঠি। শেষে লিখেছিল, অঞ্জলির ঐ স্বভাবের সুযোগ নিয়ে জর্জ বড় বেশী পাগলামী করছে। জানি না এর পরিণতি কোথায়।

শুধু চতুর্বেদীর চিঠিতেই নয়, পালাম থেকে যারা মাঝে মাঝে আদমপুরে যাতায়াত করত এবং মাঝে মাঝে এয়ারক্রাফট আনা নেওয়ার জন্য পুণা আসত, তাদের কাছ থেকেও তপন কিছু কিছু খবর পেত।

অফিসার্স মেসে সবাই মিলে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ ফ্লাইং অফিসার অগ্নিহোত্রী বলে উঠল, নেক্সড্ উইক উইল বী প্লেজান্ট।

'হোয়াই ?'

'বিকজ আই উইল বী এ্যাট আদমপুর।'

'সো হোয়াট ?'

অগ্নিহোত্রী যেন রেগে গেল, সো হোয়াট ? দেয়ার ইজ জর্জ, দেয়ার ইজ 'সনেট।'

তপন হাসে কিন্তু প্রকাশ করে না। তাড়াতাড়ি হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে হাসিটাকে মিলিয়ে দিল। তাতে তোমার কি ?'

অগ্নিহোত্রীও গেলাসে চুমুক দিল। 'জর্জের কাছে আরব্য উপন্যাস শোনা যাবে আর সনেটের পাশে বসে রোজ সন্ধ্যাবেলায় ড্রিংক করব।'

হোয়াট মোর ?

তাতো বটেই। ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের ছোকরা অফিসারদের মধ্যে যাকে নিয়ে এত আলোচনা, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য, সেই অঞ্জলির পাশে বসে বসে কাটবে সন্ধ্যা, হবে রাত্রি। কত কথা হবে, কত গল্প হবে। কতবার ওরা সবাই হো হো করে হেসে উঠবে আর হাসতে হাসতে গেলাস গেলাস হুইস্কী খাবে।

তারপর।

দিনের ক্লান্তি, সন্ধ্যার মিষ্টি স্মৃতি নিয়ে কাটবে রাত।

তারপর।

তারপর আবার সন্ধ্যার প্রত্যাশা নিয়ে উঠবে সূর্য। শুরু হবে নতুন দিন।

সিন্ধু এগিয়ে গেল আপন গতিতে। কালে কালে সংসার সমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু জর্জ ?

মোটর সাইকেলের পিছনে অঞ্জলি মাথুরকে নিয়ে দূরের বিপাশার তীরে ঘুরে বেড়াবার স্মৃতি ভুলতে পারল না কোনদিন। ইঞ্জিনে আগুন লাগতে পারে, এয়ারক্রাফট্ লস হতে পারে কিন্তু পাইলট ? বেল-আউট করল না কেন ? ভ্যাম্পায়ার স্কোয়াড্রন থেকে তপন ছিল কোর্ট অফ এনকোয়ারিতে। কোর্ট অফ এনকোয়ারিতে আর যাঁরা ছিলেন তারা 'সনেটের' কাহিনী জানতেন না। তাই তো যখন জানা গেল পার্সের মধ্যে একটা মেয়ের অস্পষ্ট ছবি

ছিল, তখন ওদের অনুমান করতে কষ্ট হয়নি জর্জের ব্যর্থ ভালবাসার জ্বালা।

শুধু তপন জানত ফটোটা সনেটের। অঞ্জলি মাথুরের। কবিতার। পোয়েমের।

॥ দুই ॥

ডেরাডুন, যোধপুর, হাকিম-পেট, আদমপুর, জামনপুর, পুণা, তেজপুর, পালাম। স্পীটফায়ার, ভ্যাম্পায়ার, হান্টার। কত পরিবর্তন হয়ে গেছে এই কটি বছরে। কত কি পেয়েছে, কত কি হারিয়েছে কিন্তু হারিয়েও হারায়নি জর্জকে। অমন একটা প্রাণোজ্জ্বল বন্ধুকে কি হারান সম্ভব?

যোধপুর এয়ার ফোর্স একাডেমীর দিনগুলি ফুরিয়ে এলো। দূর থেকে চিত্রা প্যালেস দেখে এয়ার ক্রাফ্ট ল্যান্ড করাবার দিন শেষ হলো। শিক্ষানবীশীর পালা সাঙ্গ হলো, পরিচয়-পত্র থেকে 'ক্যাডেট' মুছে গেল। এবার হলো পাইলট অফিসার। সবাই কি খুশী!

সেদিন ব্যতিক্রম ছিল শুধু জর্জ। আসন্ন যোধপুর ত্যাগের সম্ভাবনায় তার মুখে হাসি ছিল না। কালো কালো বড় বড় দুটো চোখের দুষ্টু চাহনি পর্যন্ত খুঁজে পায়নি কেউ। শেষে একটা অটোগ্রাফ খাতা কিনে সব বন্ধুবান্ধব ও ইন্সট্রাকটারদের সই নেওয়া শুধু করল। আর চাইল একটা করে ফটোগ্রাফ।

দু-একজন ইন্সট্রাকটার বল্লেন, 'কি করছ? আমরা কি ভি-আই-পি?

'আর কোথাও কারুর কাছে না হোক, আমার কাছে নিশ্চয়ই আপনারা ভি-আই-পি।'

ইন্সট্রাকটার মাথুর ও অঞ্জলি মাথুরেরও অটোগ্রাফ আর ফটো নিয়েছিল। মেসে এসেই মাথুরের ফটো কেটে বাদ দিয়ে শুধু অঞ্জলির ফটোটা নিজের পার্সের মধ্যে রেখেছিল। তারপর একবার মাথুরের অনুপস্থিতিতে দেখা করেছিল মিসেস্ মাথুরের সঙ্গে। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। তবু না যেয়ে পারেনি।

'সো আই এ্যাম গোয়িং। তাই বিদায় নিতে এলাম।'

মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে দেখে নিয়েই মাথা নিচু করেছিল জর্জ।

'এত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে আসতে পারলেন?'

'আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবারও সময় হবে না?

অঞ্জলি বুঝেছিল জর্জের কথার ইঙ্গিত। বোধহয় একটু ভাল লেগেছিল। স্বামীর ভালবাসা ছাড়াও আরো পাঁচজনের সমাদর প্রত্যাশা করে মেয়েরা। দেবর-ননদ, স্বামীর বন্ধু-বান্ধব একটু বেশী মাতামাতি করলেই নববিবাহিতার

মন খুশীতে ভরে ওঠে। তাইতো জর্জের কাছ থেকে এই উপরি পাওনাটুকু ভাল লেগেছিল অঞ্জলির।

'ডোণ্ট ওরি, আবার দেখা হবে।'

'আই হোপ সো।'

হাকিমপেটে এসেও কি কম মজা হতো?

সি-টি ইউ। কনভার্সান ট্রেনিং ইউনিট। তখন স্পীটফায়ার-এইটটিনে ট্রেনিং দেওয়া হতো। এই স্পীটফায়ার ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট-এর জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়-গুলিতে স্পীটফায়ারের বার বার উল্লেখ। চার্চিলের মোটা বইতেও কত প্রশংসা।

এই স্পীটফায়ার আর হ্যারিকেন ফাইটার না থাকলে হিটলারের আধিপত্য সুনিশ্চিত ছিল।

হাকিমপেটে গিয়ে প্রথম প্রথম এসব কাহিনী শুনতে বেশ ভাল লাগত ওদের সবার। ককপিটে বসে চঞ্চল হতো সবাই। জীবনে প্রথম ফাইটার নিয়ে উড়তে সবাই মেতে ওঠে। দুটো টোয়েণ্টি এম্ এস কামান, দুটো পয়েণ্ট ফাইভ ইঞ্চ মেসিনগান।

লাভলি!

তা'ছাড়া টেক-অফ বা ল্যাণ্ড করার ঝামেলা ছিল না। নতুন নতুন পাইলট ককপিটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট করেই উড়তে ইচ্ছা করত। স্পীটফায়ার সেদিক দিয়ে ছিল আইডিয়াল। সাতশ' গজেই টেক-অফ, ল্যাণ্ড করতো বারোশ গজে।

প্রপেলারের পাঁচটা ব্লেড ঘুরলে কি ভীষণ ভাল লাগত! চোখের নিমেষে যেন উড়ে যেত আকাশের কোলে। এয়ারবোর্ণ হতে লাগত কুড়ি সেকেণ্ড। চোখের নিমিষেই বৈকি।

স্পীটফায়ারের প্রপেলারের এই পাঁচটা ব্লেড নিয়েই কি কম মজা হতো। লম্বা লম্বা এই ব্লেডগুলো মাটি থেকে মাত্র ন' ইঞ্চি উপরে ছিল। ল্যাণ্ড করার সময় হিসাবের এক চুল এদিক-ওদিক হলেই প্রপেলার রানওয়েতে লেগে ড্যামেজ হতো। প্রায় সবার হাতেই হতো। সিনিয়র পাইলটদেরও।

অফিসার্স মেসের ওপাশের লনে একটা বিরাট গার্ডেন আম্ব্রেলার নিচে বসে ছোকরা পাইলট অফিসারের দল আড্ডা দিত। নরক গুলজার করত।

তপন বলো, গড ইজ গ্রেট।

চতুর্বেদী সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায়, হোয়াই? হোয়াই?

'এই ইয়ং এজে স্পীটফায়ারের ট্রেণিং না হলে কি সর্বনাশই হতো! এই স্পীটফায়ারের প্রপেলার যেন ইয়ং গার্ল। একটু হিসাবের ভুল হলেই ড্যামেজ হবে।'

হৈ চৈ করে উঠল চারিদিকের সবাই।

ঐ ভীড়ের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, জর্জ। বী কেয়ারফুল।

'ল্যাণ্ডিং হ্যাজ টু বী কেয়ারফুল অলওয়েজ। তবে একটু-আধটু ড্যামেজ তো সবার কাছেই হবে। অত ভয় পেলে চলে?'

ওই আবছা আলোতেই কেমন যেন একটা ইঙ্গিত ভরা দৃষ্টি বিনিময় হলো ওদের মধ্যে।

স্পীটফায়ার নিয়ে আরো মজা হতো। পি-সিক্সটিন কম্পাস হাতে ঘুরিয়ে দিতে হতো। নর্থে লাল, সাউথে ব্লু রং ছিল।

অন্তহীন আকাশের কোলে নানাভাবে নানা দিকে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে দৈবক্রমে কম্পাসের কাঁটা ঠিক উল্টো হয়ে যেত। পথভ্রষ্ট পাইলটকে কত হিমসিম খেতে হতো?

তা নিয়েও ওদের হাসাহাসি। সব কিছুতেই তখন মজা লাগত। মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে নীল আকাশের কোলে বিচরণ করতে করতে দৃষ্টিটাও যেন নীলাভ হয়েছিল। সারাদিন আকাশের কোলে থেকে সূর্যাস্তের পর মেসে ফিরে এসে ওরা সবাই কেমন যেন বদলে যেত। মাটির পৃথিবীর সব মানুষকেই যেন ভাল লাগত পরমাত্মীয় মনে করত।

শৈশব, কৈশোর যৌবন। ডেরাডুন, যোধপুর, হাকিমপেট।

যৌবনই বটে। স্পীটফায়ার উড়িয়ে আবার ল্যাণ্ড করার পর কি বিচিত্র আত্মতৃপ্তি।

আত্ম সচেতনতার, আত্মনির্ভরতার নতুন উপলব্ধি। দেহ-মনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তখন নতুন জোয়ার। হাকিমপেট তাই অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে রইল ওদের জীবনে।

শৈশবে, কৈশোরে শুধু সেলাম দিতে হতো। ডেরাডুন-যোধপুরে ওরা কেউ সেলাম পেত না। যৌবনে হাকিমপেটে এসে ওরা সেলাম পেতে শুরু করল। মেসে সেলাম, এয়ারপোর্টে ঢুকতে সেলাম, এয়ারক্রাফট-এ উঠতে নামতে সেলাম। কতজনে বলত, গুডমর্নিং স্যার।

ওরা বলত, মর্নিং।

তারপর হয়ত জানতে চাইত, হাউ আর ইউ বয়েজ?

প্রতি পদক্ষেপে নবযৌবনের স্বীকৃতি। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। সন্ধ্যার পরেও। গভীর রাত্রিতেও। ডেরাডুন-যোধপুরে এ স্বীকৃতি কল্পনাতীত। কদাচিৎ কখনও মেসের বেয়ারাদের বখশিস দিয়ে অফিসার্স মেস থেকে এক বোতল হোয়াইট হর্স বা কিং অফ কিংস আনিয়ে ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে অনাগত সমাগত যৌবনের স্বাদ পাবার চেষ্টা করত।

রাতের অন্ধকারে দূর থেকে অফিসার্স মেসের ঐ সোনালী বাতিগুলো ওদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত। কালো স্যুট পরা অফিসার্সদের মাঝে সিল্ক হোয়াইট প্রিন্স কোর্ট-প্যাণ্ট পরে বেয়ারারা গেলাস ভর্তি ট্রে নিয়ে ঘুরছে! আহা হা।

বেয়ারা নয়ত যেন মেসেঞ্জার্স অফ পিস্। শান্তির দূতেদের হাতে হাতে শান্তি সুধা।

শৈশবে-কৈশোরে যে জীবন নিয়ে এত কাব্য, হাকিমপেটে এসে তাই বাস্তবে পরিণত হলো।

সাব!

গল্পে-নেশায় এমন মত্ত যে জবাব দেবার বা ওদিকে তাকাবার পর্যন্ত অবকাশ নেই। খালি গেলাসটা এগিয়ে দিতেই ওরা তুলে নেয়, এগিয়ে দেয় আর একটা গেলাস।

হুইস্কী না ব্রান্ডি, জিন না কনিয়াক, তাও বলে দিতে হয় না। বলতে হয় না সোডা না কোল্ড ওয়াটার। আইস কিউব? পাইলট অফিসার ভার্গব? য্যাস্ট দুটো টুকরো। না, না, উনি শুধু প্লেন ওয়াটার।

বিলিয়ার্ড রুম থেকে তপনকে আসতে দেখেই ডবল হুইস্কীর গেলাসে কোল্ড ওয়াটার আর বরফের টুকরো দিয়ে রেডি করবে কেউ না কেউ।

স্পীটফায়ার উড়িয়ে যৌবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে আরো কত কি হয়।

মিসেস ভোরাকে একদল ছোকরা ঘিরে ধরেছে।

'ইউ নো এয়ার কমোডরের ওয়াইফ ইজ ভেরী বাল্কি। নাচতে জানেন না একেবারেই। অথচ এয়ার কমোডর নাচবার জন্য পাগল···

চতুর্বেদী বল্লো, শুনেছি চণ্ডীগড়ে একবার······

চতুর্বেদীর গালে একটা খোঁচা দিয়ে মিসেস ভোরা বল্লেন, চণ্ডীগড়ের ব্যাপারে তোমার এত ইণ্টারেস্ট কেন?

'টু হ্যাভ লিটল মোর নলেজ এ্যাবাউট দিস পারভার্টেড অফিসার।'

মিসেস ভোরা এবার হেসে ফেলেন। 'দ্যাটস রাইট' চতুর্বেদী। লোকটা সত্যি পারভার্টেড।

আট দশটা মাথা এক জায়গায় জট পাকিয়ে গেছে। কোনটা কার চেনা যায় না। অফিসারদের কেউ চিনতে পারেন না কিন্তু সব বেয়ারারাই ঠিক জানে। জিন এ্যাণ্ড লাইট ওয়াটারের গেলাস যাবে চতুর্বেদীর হাতে, সোডা হুইস্কী পাবে জর্জ, নায়ারের হাতে পৌঁছে যাবে ব্রান্ডির গেলাস, হাফ হুইস্কী পাবে তপন। মিসেস ভোরা পান শ্যাম্পেনের গেলাস।

স্কোয়াড্রন এ্যানিভার্সারীর পার্টির শেষে নাচে। এয়ার কমোডর। স্কোয়াড্রন লীডার বয়কে সরিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে নাচ শুরু করল···

দেন?

'হাতটা আরো একটু ঘুরে যায়, স্টেপিং আরো একটু কুইক হয়···

তারপর?

'তারপর, তারপর কি করলে বলা যায় না। এ তোমাদের স্পীটফায়ার নয় যে টোয়েণ্টি সেকেণ্ডেই টেক অফ্। এসব কাজে একটু সময় লাগে।'

মিসেস ভোরাকে গেলাসে চুমুক দিতে দেখেই ছোকরাগুলো সবাই চটপট এক সিপ খেয়ে আবার হা করে তাকায় ওর দিকে।

'স্টেপিং কুইক হতেই বুঝলাম এয়ার কমোডরের নেশা হয়েছে। আঙ্গুলগুলো বড় বেশী চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টিও যেন বদলে গেল। বাহান্ন বছরের বুড়ো রোমাণ্টিক দৃষ্টিতে আমাকে প্রায় বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে···

নায়ার চিৎকার করে উঠল, হোয়াট?

মিসেস ভোরা শাসন করেন, দু'পেগ খেয়েই আপ-সেট হবে?

··· ইন এনি কেস বুড়ো তারপর আমায় ফ্লাটারী শুরু করল···

'ইউ হ্যাভ গট এ লাভ্‌লি ফিগার।'

'থ্যাংক ইউ।'

'রোজ ডান্স কর না কেন?'

'সময় কোথায়?'

'ওসব কথা বলো না। ইচ্ছা থাকলে সব সম্ভব।'

আমি আর কি জবাব দেব? চুপ থাকলাম। কিন্তু বুড়ো কি চুপ করে থাকার পাত্র? ··

'এর আগে নাচতে?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে।'

'ঐ একটু মাঝে মাঝে ডান্স করেই এইরকম লাভলি তোমার ফিগার? ·'

ফ্লাইট লেফট্‌ন্যাণ্ট স্কোয়াড্রন লীডার উইং কমাণ্ডারদের স্ত্রীদের সঙ্গে এমন প্রাণখোলা আড্ডা দেবার সুযোগ তো এর আগে কোনদিন পায়নি ওরা কেউ। যোধপুরে থাকতে মিসেস অঞ্জলি মাথুরের পাশে মুহূর্তের জন্য আসতে পারলেই ওরা ধন্য হতো। যক্ষের মত সেই স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে কাটাত দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। আর আজ?

প্রথম প্রেমের স্মৃতি যেমন ভোলা যায় না, হাকিমপেটে পাওয়া এই মর্যাদা, এই স্বীকৃতিও তেমনি কোনদিন ভুলতে পারে না ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের অফিসাররা।

তাছাড়া ওপাশে সেকেন্দ্রাবাদ?

প্রথম প্রেমের মেয়াদ বেশী নয় কিন্তু চাঞ্চল্য অনেক। অপরিসীম। রঙীন। রোমাঞ্চ। হাকিমপেটে স্পীটফায়ার নিয়ে খেলা করার মেয়াদও বেশী নয়, কিন্তু চাঞ্চল্যে ভরা প্রতিটি মুহূর্ত। অপরিসীম আনন্দ, সীমাহীন উত্তেজনার মুহূর্তভরা একটা অবিস্মরণীয় স্মৃতির মালা।

সি. টি. ইউ'তে প্রবেশ সেপ্টেম্বরে, প্রস্থান ফেব্রুয়ারীতে। প্রথম অফিসার হয়ে রঙীন দুনিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হতে না হতেই বিদায়ের পালা। অনিত্য

সংসারে অনিশ্চিত এয়ারফোর্সের মর্মবাণী উপলব্ধির জন্যই যেন এই কনভার্সন ট্রেনিং ইউনিটের সৃষ্টি। মাটির পৃথিবীর রক্ত-মাংসের মানুষ সবকিছু জড়িয়ে ধরতে চায়। বড় বেশী জড়িয়ে ফেলে নিজেকে। ভুলে যায় এক টুকরো মুহূর্তে সব কিছু ওলট-পালট হয়। ভুলে যায় পাসপোর্টের মেয়াদ। এয়ার ফোর্সের মেয়াদ আরো স্বল্প. আরো সীমিত। সবার বেলায় নয় সত্যি কিন্তু ষোল আনা সম্ভাবনায় ভরা।

হাকিমপেটের সি-টি-ইউ'তে যেন শুধু স্পীটফায়ারের ট্রেনিংই হয় না, মাটির পৃথিবীর এই অনভিজ্ঞ মানুষগুলোকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও একটু সচেতন করে তোলা হয়। তাই কি এর নাম কনভার্সন ট্রেনিং ইউনিট?

এসব ওরা কেউ ভাবে না। ভাবতে পারে না। ভাবার অবকাশ নেই। সদ্যজাত অফিসারের দল সন্ধ্যার পর অফিসার্স ক্লাবে সানন্দে সসম্ভ্রমে হুইস্কী খাবার স্বাধীনতা পেয়ে ভাবতে পারে না নিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। হাকিমপেটের মেয়াদ কম হলেই বা?

হোসেন সাগরের পূর্বদিকের ঐ প্রশস্ত রাস্তাটা শুধু সেকেন্দ্রাবাদেই চলে যায়নি, গিয়েছিল অনেকের অনেক স্মৃতির অরণ্যে।

প্রথম জোয়ারের টানে অনেকেই ভেসে গিয়েছিল। কিছুকাল বহুজনেই কূলকিনারা দেখতে পায়নি, দেখতে চায়নি। একটু হাবুডুবু খেয়ে অনেকেই অনেক কষ্টে উজান বয়ে ফিরে এসেছিল কিন্তু পাইলট অফিসার বিশ্বাস?

পাইলট হলেও নানা কাজকর্মে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্রাঞ্চে যেতেই হয়, সবাই-কেই। পাইলট অফিসার থেকে উইং কমান্ডার, গ্রুপ ক্যাপ্টেনদেরও। জুনিয়র অফিসারদের মাঝে মাঝেই, সিনিয়র অফিসারদের কদাচিৎ কখনও। অফিসের সবাই অফিসারদের খাতির করত। ভালবাসত। হয়ত শ্রদ্ধা করত। পাইলট অফিসারদের সম্পর্কে সারা অফিসের সবারই একটা চাপা আগ্রহ উত্তেজনা থাকত। বিশ-বাইশ বছর বয়েসের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলো অফিসার হয়ে এসেছে। ওদের সারা চোখেমুখে নতুন দিনের স্বপ্ন. দেহ-মনে নতুন বসন্তের জোয়ার। একটু-আধটু হুইস্কী পড়ে কচি কচি মুখগুলো বেশ চকচক করে উঠেছে। ছোট্ট, ছোট্ট খাল-বিল নদী-নালা এসে যেন সাগরসঙ্গমে পেঁছেছে। কলকল করে সবাই হাসছে। নাচছে। আনন্দে ফেটে পড়ছে।

তাছাড়া কত বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে এদের মধ্যে। এদেরই কেউ কেউ এয়ার কমোডর. এয়ার ভাইস মার্শাল হবে। এক-একটা কম্যান্ডের চার্জ পাবে। হয়ত আরো এগিয়ে যাবে কেউ কেউ। আর যারা পাইলট অফিসার, এদেরই কেউ যে এয়ার চীফ মার্শাল হয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবে না, তা কে বলতে পারে?

তাই তো ওরা অফিসে ঢুকলেই সারা অফিসের সবাই একবার দেখে নেয়। হয়ত ভালকরে দেখে নেয়। খেয়াল করে ওদের কথাবার্তা চালচলন। সব

কিছু। ভবিষ্যতে এরা যখন আর সবাইকে ম্লান করে সূর্যমুখীর মত সাফল্য সার্থকতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, তখন তো গল্প করতে হবে।

এই অফিসেই অনেক অফিসার আছেন। স্কোয়াড্রন লীডার, উইং কমাণ্ডার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন। এদের দেখে অফিসের কেউ অমন বিস্ময়ে চেয়ে দেখে না। কোন প্রয়োজন, তাগিদ বা আগ্রহ বোধ করে না এইসব অফিসারদের দেখতে; এরা প্লেনের কক্‌পিটে না বসেই অফিসার।

সেক্সন অফিসার, আণ্ডার সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারীদের মত চেয়ারে বসে বসেই উইং কমাণ্ডার। এয়ার ফোর্সের এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মেডিক্যাল বা টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চের বড় বড় অফিসারকে দেখেও অফিসের কারুর বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য হয় না। ওদের মধ্যে সূর্যমুখীর মত মাথা উঁচু করে দিগন্তের দৃষ্টি আকর্ষণের সম্ভাবনা নেই যে।

পাইলট ইজ এ পাইলট। জাতই আলাদা বনেদী কুলীন। চীপ অফ দি এয়ার স্টাফ—এয়ারফোর্সের সর্বাধিনায়কও পাইলট। পঞ্চাশ-ষাট বছরেও এরা যৌবনের মূর্ত প্রতীক।

তবে কেউ কেউ মাঝপথে হারিয়ে যায় বৈকি! তলিয়ে যায় বৈকি! কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও নিয়তির খেলায়। কখনও ইনটেনশন্যাল, কখনও এ্যাকসিডেণ্ট্যাল! কিন্তু হয়, প্রায়ই হয়, বহুজনেরই হয়। একই বীজ একই হাতে একই জমিতে ছড়ান হয়। সবাই কি অংকুরিত হয়? অংকুরিত হলেও কি পল্লবিত হয়? পল্লবিত হয়েও মুকুলিত হয় না সবাই।

যে কোন পাইলট এলেই অফিসের সবাই মুহূর্তের জন্য হাতের কাজ বন্ধ করে এক ঝলক দেখে নেবার তাগিদ বোধ করত না। ফাইটার পাইলট এলেই ওদের নজর পড়ত। ট্রান্সপোর্ট পাইলটদের ঠিক অতটা বেশী মর্যাদা দেবার গরজ হতো না অনেকেরই। জামাই হলেই কি সবাই খাতির পায়? খাতির পায় ছোট জামাই। ট্রান্সপোর্ট স্কোয়াড্রনের পাইলটদের শেষ সীমা ভি. আই. পি এয়ার ক্রাফট-এর কমাণ্ডার হওয়া। প্রেসিডেণ্ট বা প্রাইম মিনিস্টারকে নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার মধ্যে গ্ল্যামার থাকলেও বীরত্ব নেই, রোমাঞ্চ নেই। কিছু পুলিস ইন্সপেক্টর বা এস, ডি, ও—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মুগ্ধ হলেও এয়ার ফোর্স মহলে তার বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় না বহুজনেই।

ইরং অফিসারদের সঙ্গে এ এ্যাণ্ড এস-ডি—এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যাণ্ড স্টাফ ডিউটি ব্রাঞ্চেরই বেশী যোগাযোগ রাখতে হতো। এ্যাকাউণ্টস আর ইকুপমেণ্ট ব্রাঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও তা সামান্য। একেবারেই যোগাযোগ থাকত না এডুকেশন ব্রাঞ্চের সঙ্গে। ভালবাসা বা বিয়েই হলো না, সুতরাং ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া?

মিস ক্যাসেলকে মজা করে বাজপেয়ী প্রায়ই বলত কুড ইউ টেল মী কবে আমি তোমাদের কাছে না এসে শুধু এডুকেশন ব্রাঞ্চে যাব?

'গো স্ট্রেট নাউ।'

'বাট টেল মী কোথায় আমার ছেলেমেয়ের মাকে পাই?'

এক বিপত্নীক এয়ার ভাইস মার্শালের অনুগ্রহে ও ঔদার্যে হাকিমপেট এয়ারফোর্স স্টেশনে বহু মেয়ে কাজ করে। ক্লার্ক, টাইপিস্ট, স্টেনো, সেক্রেটারী। তা হোক। সেকেন্দ্রাবাদের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েগুলো ছোট্ট ছোট্ট স্কার্ট আর নানা ডিজাইনের ব্লাউজ পরে ঘোরাঘুরি করলে সবাইকে ভালো লাগত। ছোকরাদের চাইতে বুড়োদের আরো বেশী। মেয়েরা যেদিন সর্টস্ আর স্পোর্টস্ সার্ট পরে হকি স্টিক নিয়ে মাঠে নামত, সেদিন তো সিনিয়র অফিসারদের ভীড়ে তপন-বাজপেয়ী-নায়ার বা বিশ্বাস কোন পাত্তাই পেত না।

ছোকরা ছোকরা পাইলট অফিসাররা মেয়েদের কাছে এলে যেমন খুশী হতো, না এলে মেয়েরাও তেমনি দুঃখিত হতো।

'এত সিরিয়াসলী কী পড়ছেন?'

তপন একটু ঝুঁকে পড়ে মিস গ্রিফিথকে জিজ্ঞাসা করে।

'আঃ।' মিস গ্রিফিথ যেন অবাক হয়। 'এ্যাট লং লাস্ট আপনি এসেছেন?'

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তবুও কি দেখতে পাচ্ছে না মিস গ্রিফিথ? না! আকাশ দিয়ে কত পাখি উড়ে যায়। দূর থেকে ওদের ঐ আনন্দময় মুক্ত জীবন দেখে কি সবাই সুখী হয়? বা হরিণীর চকিত চাহনি কি সবাইকে তৃপ্তি দেয়? না। পাখিকে খাঁচায় বন্দী না করে, বনহরিণীকে বুলেট দিয়ে আদর না করলে অনেকে শান্তি পায় না।

দিনের আলোয় টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখতে পায় না মিস গ্রিফিথ। সন্ধ্যার পর অফিসার্স মেসের মায়া কাটিয়ে যে ওর কাছে ছুটে আসতে পারে না, পারে না একই গেলাস থেকে ড্রিংক করতে…।

তপন একটু দূরে দূরে থাকত। অফিসে এসে হাসি মুখে কথা বলত কিন্তু সন্ধ্যার পর সে হাসিমুখ দেখবার জন্য ছুটে যেত না ওদের লালাগুড়া রেলওয়ে কলোনীতে।

তাইতো মেয়েরা ওর নামকরণ করেছিল লেডী পাইলট!

সমাজ-সংসারের বন্ধন-মুক্ত এমন জীবনেও যে সামান্য দু'চার পেগ হুইস্কীর বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে মিস গ্রিফিথের ঔদার্য উপভোগ করে না, সে লেডি পাইলট নয়ত কি? দু'চারজন ছাড়া হাকিমপেট এয়ারফোর্স স্টেশনের কে উপভোগ করেনি এই ঔদার্য? কেউ মিস গ্রিফিথকে, কেউ মিস ডীনকে, কেউ বা অন্য কাউকে। টাক মাথার প্রৌঢ় গ্রুপ ক্যাপ্টেন রামকৃষ্ণ পর্যন্ত সুযোগ পেলে সেকেন্দ্রাবাদ এসে কৃতার্থ হতো।

'হাউ আর ইউ মিস ডীন?'

'ফাইন। থ্যাংক ইউ স্যার।'

'দেয়ার ইজ সামথিং ফর ইউ। একদিন সময় পেলে তোমাকে দিয়ে আসব।'

ইঙ্গিত বোঝে মিস ডীন। সময় পেলে নয়, সময় দিলেই গ্রুপ ক্যাপ্টেন ছুটে আসবে ওর কাছে, তা সে জানে, বোঝে।

'আই উইল টেল ইউ টুমরো স্যার।'

'মনে থাকবে তো?'

'এত অকৃতজ্ঞ নই স্যার।'

'তা আমি জানি। সেইজন্যই তোমাকে একটা জিনিস দেব।'

'সো কাইন্ড অফ ইউ স্যার।'

'দেখবে তুমি অবাক না হয়ে পারবে না।'

তা জানে মিস ডীন।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে এসেছিলেন। উনি নিজে ড্রিংক না করলেও এক বোতল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন এনেছিলেন পকেটে করে, নিজে গেলাসে ঢেলে আদর করে খাইয়ে দিয়েছিলেন মিস ডীনকে।

'তোমার মা কোথায়?'

'ওর আজ নাইট ডিউটি।'

'হোল নাইট?'

'হ্যাঁ।'

আধ বোতল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খাবার পর আর 'স্যার' বলে সম্মান দিতে মনে থাকে না মিস ডীনের। তারপর?

গ্রুপ ক্যাপ্টেন নিজেই সুইচ অফ্ করে দিয়ে বলেছিলেন, উড ইউ কেয়ার টু ট্রাই দিস আণ্ডার গার্মেন্টস্?

'আণ্ডার গার্মেন্ট্স্?' অবাক হয়েছিল মিস ডীন।

'হ্যা হ্যা।' লণ্ডন থেকে তোমার জন্য আনিয়েছি।

ঐ অন্ধকারেই গ্রুপ ক্যাপ্টেনকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে বলেছিল, 'হাউ লাভলি ইউ আর!'

লণ্ডন। নাম শুনেই চমকে যায়।

হোয়াইট বর্ডার দেওয়া কালো সিল্কের গাউনটা ছেড়ে উলওয়ার্থের আণ্ডার গার্মেন্টস্ পরে আলো জেলেছিল মিস ডীন নিজেই।

রাতের অন্ধকারে হাস্নাহানার গন্ধে মানুষ মদির হয়, বিভোর হয়। নেশা লাগে মনে মনে। কিন্তু দিনের আলোয়? সে গন্ধ হারিয়ে যায়, সে নেশা ফুরিয়ে যায়। শরতের নীল আকাশের ছোট ছোট রুপালী মেঘের টুকরো উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায়। চোখের সামনে। সবার চোখের সামনেই। হারিয়েও যায়, মিলিয়েও যায় চোখের সামনেই।

অনন্তকালের নীল আকাশের গর্ভে একদিন সব কিছুই হারিয়ে যায়—

মিলিয়ে যায়। হাস্নাহানার মত আরো কত গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না উত্তর জীবনে, উত্তরকালে।

তা হোক। টুকরো টুকরো। মুহূর্তের নেশায় প্রৌঢ় গ্রুপ ক্যাপ্টেন যখন মিস ডীনকে নিয়ে বিভোর থাকে, তখন অতশত হিসাবনিকাশ করা যায় না। অসম্ভব। মনে হয় ঐ ক'টি মুহূর্তই চিরস্মরণীয়, অবিস্মরণীয়। মনে হয় অফুরন্ত অনন্ত।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর জীবনের হিসাবনিকাশ মিলাতে গিয়ে কয়েকটা ভাউচার খুঁজে পাননি। অপূর্ণ হিসাব পূর্ণ করার জন্য মাঝে মাঝে ছুটে যান মিস্ ডীনের কাছে।

কিন্তু বিশ্বাস? তরুণ পাইলট অফিসার সমীরণ বিশ্বাস? জীবনে এই সাত সকালেই সে হাস্নাহানার গন্ধে মাতাল হলো কি করে? দই খেতে ভাল লাগে কিন্তু দইয়ের মাথাটা খেতে আরো মিষ্টি, আরো ভাল লাগে। গ্রুপ ক্যাপ্টেনের চাইতে পাইলট অফিসারের প্রতি, তাই কি ওদের নজর পড়েছিল?

সুন্দর স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। কথায়-বার্তায় চালচলনে ভরা যৌবনের প্রাণ-চাঞ্চল্য। সবার ভাল লাগে। দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকেরই। অফিসে পার্টিতে। সর্বত্র।

একটু দেরীই হয়েছিল। হোসেন সাগরের পূর্বদিকের ঐ প্রশস্ত রাস্তাটা দিয়ে একটু জোরেই সাইকেল চালাচ্ছিল পাইলট অফিসার সমীরণ বিশ্বাস। ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাবে ডান্স নাইট। বছরে ঐ একটা দিনই এমন রাত আসে। নিউ ইয়ার্সে সারা রাত হৈ চৈ হয়, মাঝে মাঝে আলো অফ হয়ে যায়। সবই সত্যি কিন্তু সে রাত্রে বড় আজেবাজে লোকের ভীড়। এ্যানুয়াল-ড্যান্স নাইটে একটি বাজে লোক থাকার উপায় নেই। মেম্বার্স এ্যান্ড দেয়ার পার্সোন্যাল গেষ্টস্ ওন্‌লি। সারা রাত নাচ হবে।

মেসের বেয়ারা আর নাইট ডিউটির গার্ডকে ম্যানেজ করে বিশ্বাস চলছে। কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। রাত দুটো তিনটে চারটে।

পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে সাইকেল। বেজওয়াদা যাবার রেল লাইন পার হয়েছে অনেকক্ষণ। ক্যান্টনমেন্টে এসে গেছে। সামনেই ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাবের কম্পাউন্ড। সারি সারি গাড়ি ঢুকছে ক্লাবের গেট দিয়ে। সাইকেলের স্পীডটা কমাতেই হল বিশ্বাসের। এই ক্যান্টন-মেন্টের কিছু কিছু মেম্বার্স আর তাদের কোন গেষ্টরা ইভিনিং ড্রেস পরে হাঁটতে হাঁটতেই ঢুকছেন ক্লাবের গেট দিয়ে।

বিশ্বাস আরো সতর্ক হলো। একটু এপাশ-ওপাশ চাইতেই দৃষ্টিটা একবার আটকে গেল।

মিস ম্যাকডোনাল্ড।

মুহূর্তের জন্য একবার দেখেই দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নেয় বিশ্বাস। গেটের

দু'পাশে গার্ডেন ল্যাম্প থাকলেও ক্রীপারের ছায়ায় সবার মুখ ঠিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। ভুল করে অন্য কারুর দিকে তাকানো অশোভন।

খুব আস্তে আস্তে গেটটা পার হলো। গার্ডেন ল্যাম্পের আলোয় আর ক্রীপারের ছায়া নেই, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবাইকে।

'হ্যালো অফিসার?'

বিশ্বাসের স্বপ্নভঙ্গ হলো। হ্যাঁ মিস ম্যাকডোনাল্ডই তো! ওদের অফিসের একেবারে কোণায় বসে যিনি লিভ রেকর্ডস খুট খুট করে টাইপ করেন সেইই তো! ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাবের গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে ঢুকতে গিয়েই এমন একজন পরিচিতাকে পেয়ে সমীরণ বিশ্বাস আনন্দে খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

'হ্যালো, হ্যালো, হাউ আর ইউ?'

আঁট-সাট কালো ইভিনিং গাউনটা একটু দুলিয়ে সারা মুখে খুশির আবীর ছড়িয়ে মিস ম্যাকডোনাল্ড জবাব দেয়, ফাইন, থ্যাংক ইউ।

বিশ্বাস সাইকেল থেকে নেমে পড়েছে। পাশাপাশি হাঁটছে। ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে। মিস ম্যাকডোনাল্ডও। তবুও যেন দুলে দুলে উঠছে। শান্ত সমুদ্রে যেমন ঢেউ ওঠে। মুগ্ধ হয়ে দেখে বিশ্বাস।

দেখে মিস ম্যাকডোনাল্ডও। জানতে চায়, 'সো ইউ হ্যাভ ফর ডান্সিং?'

বিশ্বাস বলে ডান্সিং-এর ডান্সারদের জন্যই এসেছি।

'গুড গুড!'

আর একটু এগিয়েই সাইকেল রাখল। টোকনটা পকেটে পুরল।

বিশ্বাস এই প্রথম এসেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই কিছুই। হবে শুনেছে অনেক কিছু। অনেক খ্যাতি, অনেক কাহিনী। হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদের কত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন হয় এই রাত্রে, নিজাম প্যালেসের ছেলে-মেয়েরাও আসে। আসে আরো কত কে? কেউ সামাজিক খ্যাতির জন্য, কেউ আপন আনন্দের লোভে।

'এক্সকিউজ মী, আপনি কি প্রত্যেক বছরই আসেন?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড একটু হেসে বলে—'টোয়েন্টিওয়ানের নীচে কাউকে আসতে দেন না এঁরা। গতবারই প্রথম আসি।'

'হাউ ডিড ইউ লাইক ইট?'

'ওঃ ফাইন।'

'আমি প্রথম আসছি। প্লিজ একটু গাইড করবেন।'

'ডোণ্ট ওরি অফিসার। আই উইল বী অল দি টাইম।'

মিস ম্যাকডোনাল্ডের আশ্বাসে বিশ্বাস নিশ্চিন্ত হয়। খুশী মনেই দুজনে ভিতরে গেল। বার-বয়রা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ড্রিংক সার্ভ করতে। প্রতি মিনিটে বটল্ ওপেনারের একটু আওয়াজ। একটু মুচকি হাসি।

সবাই হাসছে। সবাই ড্রিংক নিয়ে ঘুরছে। চারপাশে। সবাই সবার মধ্যে। পরিচয় না থাকলেও সবাই সবাইকে বলছেন, হাউ আর ইউ?

'ফাইন। থ্যাংক ইউ।'

বলবে না? সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যই তো সবাই এসেছেন। কেউ প্রফেশন্যাল এটিকেটের জন্য, কেউ এসেছেন মর্যাদার লোভে। মিস ম্যাক-ডোনাল্ড বা বিশ্বাসের মত কেউ কেউ এসেছেন অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ খুঁজতে।

বিশ্বাসকে পেয়ে মিস ম্যাকডোনাল্ড খুব খুশী। এমন দিনে একলা একলা আসা আনন্দের বা সম্মানের নয়। রেলওয়ে কলোনী লালাগুড়ার অনেক ছোকরাই ওর সঙ্গে এলে খুশী হতো কিন্তু তাতে কি মর্যাদা বাড়ত? নাকি মন ভরত?

বিশ্বাস তপনের মত সংযত নয়, বাজপেয়ীর মত শুধু বাকপটুও নয়। শুধু সরস মন নয়, সুন্দর স্বাস্থ্যবানও বটে। কোন না কোন জুনিয়র অফিসারের সঙ্গে আসত, তবে বিশ্বাসকে পাবে ভাবতে পারেনি।

ঐ ভীড়ের মধ্যেই ড্রিংক হাতে নিয়ে দুজনে একটু পাশে সরে দাঁড়াল।

'আই এ্যাম ভেরী গ্ল্যাড যে তুমি এসেছ।'

মিস ম্যাকডোনাল্ডের কথায় একটু অবাক হয় বিশ্বাস।

'কেন?'

'সব ছেলেরাই মেয়েদের সান্নিধ্য চায় তাই অনেকেই জানে না আমরা কি চাই কি ভালবাসি।'

'ইজ ইট?'

'তবে কি?'

'আমি আসতে কেন খুশী হয়েছ, তাতো বল্লে না।'

ইউ আর রিয়েলি এ ইয়ংম্যান।'

'তার মানে?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড বিশ্বাসের কানে কানে বল্লো, এক্ষুণি সব কথা বলা কি ঠিক হবে? ওয়েট এ্যান্ড সী।

এক রাউন্ড শেষ হলো। আবার গেলাস ভর্তি করে নিল। ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল দুজনেই। চারিদিকে ঘুরে ফিরে আবার দেখা হলো। আবার ড্রিংক নিতে না নিতেই মাইক্রোফোনে এ্যানাউন্সমেন্ট, ফ্লোর খালি হয়ে গেল।

'কাম অন। চলো একটা ভাল জায়গা দেখে আমরা বসি।'

বিশ্বাস ওকে অনুসরণ করে প্রায় কোণের দিকে একটা টেবিলের এক পাশে বসল। পাশাপাশি। কাছাকাছিও বটে।

সতেজ হয়ে উঠেছিল সবাই। সবার চোখের দৃষ্টি সার্চ লাইটের মত ঘুরতে

শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আলোর দীপ্তি কমে গেল চারপাশে। একটা তীব্র রঙীন আলো হঠাৎ দাপাদাপি শুরু করল ফ্লোরের মাঝখানে।

মিস ম্যাকডোনাল্ড আস্তে বিশ্বাসের একটা হাত চেপে ধরে বল্লেল, কি সুন্দর তাই না?

'তুমি আরো সুন্দর।'

'কেন বাজে কথা বলছ?'

'ফর গডস সেক বিলিভ মী. একটুও বাজে কথা বলছি না।'

'কই অফিসে এলে তো বিশেষ কথাবার্তা বল না।'

'এসব কথা কি অফিসে বলা যায়?'

'অফিসের পরেও তো বলতে পারতে।'

'বুড়োগুলো পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে এমন হ্যাংলামো করে যে আমি আর কি বলব?'

'দ্যাটস রাইট বিশ্বাস।'

মিস ম্যাকডোনাল্ড কথা শেষ করার আগেই বার-বয় এসে গেছে। বিশ্বাস তাড়াতাড়ি গলায় ঢেলে দিল বাকিটুকু। একটা বড় হুইস্কী তুলে নিল।

'ফিনিস ইওর ড্রিংক।'

'সুড আই?'

'তবে কি?'

মিস ম্যাকডোনাল্ডও শেষ করে আবার একটা ভর্তি গেলাস তুলে নিল।

কখন যে নাচ শুরু হয়ে গেছে, তা দুজনের কেউই টের পায়নি। পরপর তিন চারটে হুইস্কী খেয়ে বেশ একটু নেশা নেশা ভাব লাগছিল দুজনেরই।

'তুমি নাচবে না?'

'তুমি নাচবে?'

বিশ্বাস হাসল। 'আমি নাচতে পারি না।'

'আমাকে আগে বলনি কেন? আমি তোমাকে নাচ শিখিয়ে দিতাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। এবার শিখিয়ে দিও। বাট ইউ গো এ্যান্ড ডান্স।'

মিস ম্যাকডোনাল্ড হাসল।

'হাসছ কেন?'

'হাসব না?' একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বল্লো, 'আমাদের তোমরা ভীষণ খারাপ মনে কর, তাই না?'

অস্বস্তি বোধ করে বিশ্বাস, 'না. না, খারাপ মনে করব কেন?'

'তবে তুমি আমাকে নাচতে বলছ কেন?'

'বাঃ! তুমি আজকে নাচতে আসনি?'

'নিশ্চয়ই এসেছি। তুমি এতক্ষণ আমাকে কম্পানী দিলে। এতগুলো

টাকা খরচ করে আমাকে ড্রিংক করালে, আমি তোমাকে ফেলে অন্য পুরুষের সঙ্গে নাচব ?'

বিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে ওর কথা শোনে।

মিস ম্যাকডোনাল্ডই জবাব দেয় নিজের প্রশ্নের, 'নেভার, নেভার।'

একবার নাচ শেষ হতেই আলো জ্বলে উঠল। বিশ্বাসকে নিয়ে মিস ম্যাকডোনাল্ড বাইরে এসে বল্লো, 'তুমি রাত্রে মেসে ফিরবে নাকি ?'

'সেসব ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'আমার ওখানে যাবে ?'

'তোমার ওখানে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ওখানে।'

'কিন্তু তোমার পেরেন্টস, ভাইবোন……

'সেসব চিন্তা তোমার কেন ? চল আজ তোমাকে নাচ শিখিয়ে দেব।'

'নাচ ?'

'হ্যা, হ্যাঁ। ইউ মাষ্ট মেক এ বিগিনিং রাইট টু-নাইট।'

বিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত করতে পারেনি সে আমন্ত্রণ। বরং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল। সবার অলক্ষ্যে ওরা দুজনে ইউনাইটেড সার্ভিসের ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়ল। সাইকেলের সামনে মিস ম্যাকডোনাল্ডকে বসিয়ে বিশ্বাস এলো গোলাগুড়া রেল কলোনীতে।

বেশ লেগেছিল সাইকেল জার্নি'টা। মাঝে মাঝে বিশ্বাসের বুকে মাথা রাখছিল মিস ম্যাকডোনাল্ড। 'ইট ইজ এ লাভলি নাইট, তাই না ?'

ওর মুখের পর একটু মুখ রেখে বিশ্বাস বল্লো, এর চাইতে মধুর রাত্রি তো আমার জীবনে আসেনি।

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

ওদের কোয়ার্টারের সামনে পেঁছেই মিস ম্যাকডোনাল্ড বিশ্বাসকে একবার জড়িয়ে ধরে আদর করল, ইউ আর এ লাভলি বয়।

নিঝুম রাত। অধিকাংশ ফ্ল্যাটের আলো নিভে গেছে। কিছু কিছু তখনও নীল আলো জ্বলছে। হয়ত বিশ্বাসের মতই কোন অতিথির আপ্যায়ন চলছে। হয়ত বা স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা।

আস্তে আস্তে দুজনে তিনতলায় উঠে গেল। বিশ্বাস দেশলাই জ্বালল, মিস ম্যাকডোনাল্ড লক খুলে ঘরে ঢুকল।

দরজার পাশেই সুইচ। সুইচ 'অন' করল কিন্তু আলো জ্বলল না। কয়েকবার চেষ্টা করল। না, তবুও না। নিশ্চয়ই বালবটা ফিউজ হয়ে গেছে। বিশ্বাস বালবটা খুলে দেখল। দুটো দেশলাই কাঠি একসঙ্গে জেলে দেখল। হ্যাঁ, খারাপ হয়ে গেছে।

হাতড়ে হাতড়ে একটা মোমবাতি বের করল মিস ম্যাকডোনাল্ড। ছোট্ট মোমবাতি। বাথরুমে আলো নেই বলে ওটা রেখেছে। সেটাই জ্বালল।

'আই এ্যাম সরী।'

'নট এ্যাট অল।'

'ফ্যানটাও চলবে না। তোমার যে ভীষণ গরম লাগবে।'

'তোমার গরম লাগবে না?'

'ফ্যানের হাওয়া না হলেও আমরা থাকতে পারি, বাট' ..

একটু পরে আবার বল্লো, 'তবে কি তুমি মেসে ফিরে যাবে?'

'তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড ওপাশ থেকে প্রায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বিশ্বাসকে, 'বিলিভ মী বিশ্বাস, তোমাকে আমি কোনোদিন চলে যেতে বলব না।'

'সত্যি?'

'ক্রাইস্টের ফটো ছুঁয়ে বলব?'

'না, না। ক্রাইস্টকে ছুঁয়ে বলতে হবে না।' বিশ্বাস বুকের মধ্যে মিস ম্যাকডোনাল্ডকে টেনে নিয়ে বলে, 'তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট।'

লালাগুড়া রেল কলোনীর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সম্পর্কে অনেক সরস কাহিনী শুনেছে বিশ্বাস। কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থ করার সামগ্রী হিসেবেই ওদের ভাবত। মিস ম্যাকডোনাল্ডকেও। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মুখের একটি কথায় বিশ্বাসের সব ধারণা পাল্টে গেল। মিস ম্যাকডোনাল্ডকে বড় ভাল, বড়ো পবিত্র মনে হলো।

ঘরে ছোট্ট মোমবাতির শেষ আলোটুকু ছড়িয়ে হারিয়ে গেল কিন্তু ওদের দুটি মনে নতুন অনুভূতির আলো জ্বলে উঠল। ঐ অন্ধকারের মধ্যেও ওদের দুজনের চোখেই ভগবান যীশুর মূর্তিটা যেন আরো স্পষ্ট, উজ্জ্বল মনে হলো।

ছোট্ট একটা মুহূর্ত, একটা কথা, একটু হাসি, এক ফোঁটা চোখের জলই মানুষের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ঐ একটা ক্ষণিকের স্মৃতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে দীর্ঘ ইতিহাস।

ঐ রাত্রের ঐ একটি মুহূর্তের মধ্যেও যে অমনি একটা সম্ভাবনা ছিল, তা ওরা তখন বুঝতে পারেনি। তবে এইটুকু বুঝেছিল মুহূর্তের ঐ উপলব্ধি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। পরস্পরের প্রতি একটা নির্ভরতা অনুভব করেছিল প্রথম আলিঙ্গনের মধ্যে

'আজ অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে এমনভাবে পাব ভাবতে পারিনি।'

'কেন?'

'ভেবেছিলাম আলো জ্বলবে আর তোমাকে নিয়ে সারা রাত নাচব কিন্তু গড ইজ উইলিং আদারওয়াইজ।'

'তার মানে?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড একটু এগিয়ে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। একবার বাইরের আকাশ আর নিস্তব্ধ পৃথিবী দেখে নিয়ে বিশ্বাসের দিকে ফিরল।

'ঠিক জানি না বিশ্বাস। তবে টু-নাইট সীমস্ টু বী ভেরী ডিফারেণ্ট।'

বিশ্বাস এগিয়ে গিয়ে ওর হাত দুটো ধরে বল্লো, 'তোমাকে দেখে মনে হয় না তো তুমি এত সেণ্টিমেণ্টাল।'

ঐ আবছা অন্ধকারেই বিশ্বাস বেশ বুঝতে পারল ও একটু মুচকি হাসল।

তোমরা টেগোরকে পেয়েছিলে বলে তোমাদের সেণ্টিমেণ্টের কথা লেখা হয়েছে, লোকে জানতে পেরেছে। আমাদের মধ্যে টেগোর জন্মায়নি বলে আমাদের সেণ্টিমেণ্টের কথা কেউ জানে না কিন্তু তার মানে এ নয় আমাদের সেণ্টিমেণ্ট নেই।'

'তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেলে ?'

'না, না। দুঃখ পাব কেন বরং খুশী হয়েছি।'

'খুশী ?'

'খুশী বৈকী। তোমার আগেও আমার এই ঘরে কিছু কিছু অফিসার এসেছেন, রাত কাটিয়েছেন কিন্তু কারুর সঙ্গে এমন করে কথা বলার সুযোগ পাইনি।'

ওর দেহটা নিয়ে বহুজনে ছিনিমিনি খেলেছে। সে কথাটা এমন সহজভাবে বল্লো দেখে বিশ্বাস স্তম্ভিত হয়ে গেল। বহুজনের জীবনেই বহু ঘটনা, বহু কাহিনী ঘটে থাকে কিন্তু লালাগুড়া রেল কলোনীর এই সাধারণ মেয়েটার মত স্বীকার করার সাহস ক'জনের হয় ?

মিস ম্যাকডোনাল্ড হঠাৎ একটু এপাশে এসে দু'হাত দিয়ে বিশ্বাসের গলাটা জড়িয়ে ধরল। 'আচ্ছা তুমি আমাকে কিছু বলে ডাকবে না ?'

'কি নামে ডাকলে তুমি খুশী হবে ?'

'তা জানি না। তবে ডার্লিং বলে ডাকবে না। ডার্লিং শুনলেই মনে হয় বড় কমার্শিয়াল।'

'তোমাকে ডোনা বলে ডাকব ?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড একটু ভাবল। 'ডোনা ? নট ব্যাড বাট হোয়াই নট এ রোমাণ্টিক বেঙ্গলী নেম ?'

'তুমি বাঙ্গালী নাম পছন্দ কর ?'

'আই উইল ফিল অনার্ড।'

বিশ্বাস আপন মনে ভাবল। বেশ কয়েক মিনিট। তারপর বল্লো, 'এই রাত্রির অন্ধকারে তোমাকে আমি পেলাম। তোমার নাম রইল তামসী।'

'টামোসীর মিনিং কি ?'

'রাত্রি। স্নিগ্ধ, শান্ত, অন্ধকার রাত্রি।'

'টামোসী?'

'হ্যাঁ, তামসী। সারাদিনের অশান্তির পর মানুষ রাত্রিতেই একটু শান্তি পায়। তোমাকে পেয়েও আমি শান্তি পাব, তাই না?'

'তুমি সিরিয়াসলী বলছ, নাকি সকাল হলেই সব ভুলে যাবে?'

সন্ধ্যার পর, রাত্রির অন্ধকারে অনেকের অনেক মিষ্টি কথা শোনে ওরা। স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে ওঠে ঐ রাত্রির অন্ধকারেই কিন্তু দিনের আলোয়? সে তাসের ঘর ভেঙ্গে যায়। মুছে যায়, হারিয়ে যায় সব কিছু। সব স্বপ্ন, সব মিষ্টি কথা, সব অঙ্গীকার।

মিস ম্যাকডোনাল্ড সঙ্গে সঙ্গে ওকে আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে বল্লে, 'সরি। তোমাকে অবিশ্বাস করছিলাম, তাই না? কাউকে বিশ্বাস করতে শিখিনে বলেই কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেল। আমি রিয়েলি সরি, ভেরী সরি। ইউ মাষ্ট পার্ডন ইওর ট্যামোসী।'

বিশ্বাসের ভীষণ ভাল লাগল। একটু আদর না করে পারল না।

জানালার ধারে দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। মিস ম্যাকডোনাল্ড ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লো, 'দেখেছ আমি কি হোপ্লেস মেয়ে?'

'কেন?'

'তুমি প্রথম দিন আমার ঘরে এলে অথচ তোমাকে কিছু খেতে দিলাম না। তাছাড়া তোমাকে বিশ্বাস করতে দিচ্ছি না।'

'না, না, আমি কিছু খাব না।'

'তা হয় না।'

মিস ম্যাকডোনাল্ড আস্তে আস্তে বিশ্বাসের হাত ধরে এগিয়ে গেল ঘরের কোণার দিকে, একটা আলমারীর সামনে। 'একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরতো।'

বিশ্বাস একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল। একটা বিস্কুটের প্যাকেট আর ছোট্ট প্লেটে রাখা কয়েকটা আঙ্গুর বের করল। বিস্কুটের প্যাকেটটার মধ্যে হাত দিয়ে মাত্র একটা বিস্কুট পেল।

'দেখছ কি কেলেঙ্কারী! মা একটা বিস্কুট আছে।'

বিশ্বাস বিস্কুটটা হাতে নিয়ে অর্ধেকটা ভেঙ্গে ওর মুখে দিয়ে বল্লে, 'এই নাও।'

'আবার আমাকে দিচ্ছ কেন?'

'আমি দিচ্ছি। খেয়ে নাও।'

ঐ কয়েকটা আঙ্গুরও দুজনে ভাগ করে খেল।

বিশ্বাস আবার কয়েকটা দেশলাই কাঠি জ্বালল। মিস ম্যাকডোনাল্ড হাতড়ে হাতড়ে একটা পায়জামা বের করে বল্লো, 'এইটা পরেই কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দাও।'

'কি দরকার ? গল্প করেই কাটিয়ে দিতাম রাতটা ।'

'না, না, তা হয় না। তোমার ফ্লাইং আছে। একটু রেস্ট না নিলে হয় ?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড টেবিলের 'পর রাখা টাইমপিসটার দিকে দেখল। রেডিয়াম দেওয়া কাঁটা জ্বল জ্বল করছে।

'এখন মোটে একটা বাজে। তাছাড়া তোমায় তো খুব ভোরে উঠতে হবে।'

বিশ্বাস আর প্রতিবাদ করেনি। ঘরের এক কোণায় গিয়ে জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পরল। মিস ম্যাকডোনাল্ডও একটা নাইটি পরল।

'একটু কষ্ট করে শুতে হবে কিন্তু।'

'কষ্ট হবে কেন ?'

'এই গরমে এইটুকু ঘরে। তাছাড়া—

'তাছাড়া আবার কি ?'

'এই বিছানায় আমার পাশে।'

বিশ্বাস ওকথার কোন জবাব দিল না। কি জবাব দেবে ? মিস ম্যাকডোনাল্ড টাইমপিসটায় এ্যালার্ম দেবার ব্যবস্থা করে একটা পুরানো ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে শুতে এলো।

'নাও, তুমি শোও, তোমাকে একটু হাওয়া দিই।'

'না, না হাওয়া করতে হবে না।'

'তুমি না বল্লেই হলো আর কি ?'

'আমি বলছি হাওয়া করতে হবে না।'

'বেশ তাহলে বেনিয়ানটা খুলে শোও। আমি তোমার গায়ে একটু পাউডার মাখিয়ে দিই'

'দেবে ?'

বিশ্বাস আর আপত্তি করল না।

মিস ম্যাকডোনাল্ড ওর গায়ে পাউডার দিয়ে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ কেউই কোন কথা বল্লে না। তারপর মিস ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞাসা করল. 'ঘুমিয়েছ ?'

'না।'

'মেয়েদের জীবনে একজন পুরুষ না থাকলে ঠিক নির্ভরতা আসে না। রাত্রে একলা একলা থাকতে সত্যি ভাল লাগে না কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

'রাতে পুরুষগুলো ঠিক মানুষ থাকে না. দে বিকাম এ্যানিমালস।'

মুখে সমর্থন জানাতে না পারলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না বিশ্বাস।

'আজ জীবনে প্রথম আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব।'

'ইউ থিংক সো ?'

'একশ' বার মনে করি।'

'এই রাত্রির অন্ধকারে তোমাকে পাশে পেয়ে, হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে আমিও যে পশু হয়ে উঠব না, তা তুমি কেমন করে জানলে ?'

'তুমি আমাকে আদর করতে পার, ভালবাসতে পার, উপভোগও করতে পার কিন্তু পশু হতে পারবে না।'

'তুমি ঠিক জান ?'

'জানি।'

'কেমন করে ?'

'এ্যাফটার অল আমি তোমার শান্ত স্নিগ্ধ ট্যামোসী। তাই না ?'

বিশ্বাস এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে ছিল। এবার সত্যি দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিল তার তামসীকে।

তামসী বিশ্বাসের বুকের মধ্যে মাথাটা রেখে পাঁজর কাঁপানো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে, 'আঃ! কি শান্তি!'

'সত্যি ?'

'তোমার বুকের মধ্যে শুয়ে তোমাকেই মিথ্যে কথা বলব ? আই এ্যাম নট সো ব্যাড।'

কত পুরুষের কত রাত্রির কি বিচিত্র বিশ্বাসঘাতকতার পর এত দুঃখ অত আক্ষেপ, মনের মধ্যে জমতে পারে ? যাক দিনেরবেলায় দেখে বিশ্বাসের সমস্ত দেহমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, শিরা-উপশিরার মধ্যদিয়ে রক্ত দৌড়া-দৌড়ি করেছে, তাকেই এই রাত্রির অন্ধকারে বুকের মধ্যে পেয়ে বিশ্বাসের সব চাঞ্চল্য কোথায় হারিয়ে গেল। কিন্তু কেন, কেন এমন হলো ?

॥ তিন ॥

সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চোখের আড়ালে অতুঙ্গ পাহাড়ের কোলে জন্ম নেয় ছোট্ট একটা নদী। একটা ক্ষীণ জলের ধারা। অসংখ্য চড়াই-উতরাই বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে সে ছুটে চলে সমতলের দিকে। নিয়তির দিকে, পরিণতির দিকে। জীবনের পূর্ণতার দিকে। কেউ পেঁছিতে পারে, কেউ পারে না। কেউ হারিয়ে যায়, লুকিয়ে পড়ে। তা হোক। কৈশোর যৌবনের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে কোনো শিশু তো আত্মহত্যা করে না। করতে পারে না। সে মুক্তির আনন্দে ছুটে চলে।

লালগুড়া রেল কলোনীর ছোট্ট অন্ধকার ঘরে যে দুটি প্রাণের ছোট একটি স্বপ্ন জন্ম নিল, তাও ছুটে চল্লো উদ্দাম গতিতে। চড়াই-উতরাই বাধা-বিপত্তি আলোচনা-সমালোচনা গ্রাহ্য না করে। রেল কলোনীর ছোকরার দল

বিশ্বাসকে দেখলেই টিকা-টিপ্পনী দিত। কখনও দূর থেকে, কখনও পাশ দিয়ে যাবার সময়। ও গ্রাহ্য করত না। কিন্তু আস্তে আস্তে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল। একদিন একটা ছোকরা ওদের দুজনকে অশ্লীল মন্তব্য করলে বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে কলার চেপে ধরে মারতে গিয়েছিল। তামসী ছাড়িয়ে দিয়েছিল। পরে বলেছিল, 'রাস্তার কুকুর তো ঘেউ ঘেউ করবেই। তার জন্য তুমি কেন রেগে যাবে ?'

'তুমি আর লালাগুড়ায় থেকো না।'

'কোথায় থাকব ?'

'শহরের মধ্যে কোথাও একটা ছোট ফ্ল্যাট নাও।'

'মাই গড ! আমার পুরো মাইনে চলে যাবে।'

'সেজন্য তোমার এত চিন্তার কি ? আমি তো আছি।'

'তামসী শুধু একটু হাসে।

'হাসছ কেন ?'

'হাসছি তোমার পাগলামী দেখে।'

'পাগলামীর কি হলো ? তোমাকে ঐ অসভ্য ছোকরাগুলো অপমান করবে আর আমি তাই দিনের পর দিন সহ্য করব ?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড আবার হাসে। 'তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে পড়! শহরের ছোট্ট ফ্ল্যাটে কেন, একেবারে তোমার অফিসার্স কোয়ার্টারে যাব।'

নওবত পাহাড় পিছনে ফেলে নামপল্লী পাবলিক গার্ডেনের দিকে এগুতে এগুতে বিশ্বাস একবার ওর হাত চেপে ধরে বল্লে, 'অফকোর্স যাবে কিন্তু তার আগে'··

তামসী বাধা দিল, 'না, না, তা হবে না। যখন বাড়ী ছাড়ব তখন বুক ফুলিয়ে যাব, সারা দুনিয়াকে জানিয়ে যাব।'

সেদিনের স্বপ্ন তামসীকে মদির করে রেখেছে। স্বপ্ন দেখে ও লাল বেনারসী পরেছে। মাথায় ঘোমটা। কপালে সিঁদুর। সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে কঙ্কন। মাঝে মাঝেই বিশ্বাসকে বলে, 'আমাদের চাইতে তোমাদের সিস্টেম অনেক ভাল।'

'কোন সিস্টেম ?'

'বিশেষ করে সিঁদুর পরা।'

'কেন ?'

তামসী একটু হাসে। সলজ্জ হাসি। মনের পরিতৃপ্তির ঈষৎ ইঙ্গিত মাত্র ঠোঁটের পাশে ইশারা করে। আস্তে বলে, 'কি সুন্দর দেখতে লাগে।'

'সিঁদুর পরলে ভাল লাগে ?'

'একশ' বার। তাছাড়া কত মর্যাদা।'

'তার মানে ?'

'সিঁথিতে, কপালে সিঁদুর থাকলে সারা সমাজ তাকে কত শ্রদ্ধা করে। আমাদের সমাজে কোন বিবাহিতা মেয়েই এই শ্রদ্ধা, এই সম্মান পায় না, পাবার কোন উপায় নেই।'

লালাগুড়ায় বাঙালী নেই। হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদেও বিশেষ নেই। তবে হাকিমপেট এয়ার ফোর্স স্টেশনে সবসময়েই কিছু বাঙালী অফিসার আর এয়ারম্যান থাকে। মিস ম্যাকডোনাল্ড হাকিমপেটে চাকরি করতে গিয়েই কিছু বাঙ্গালী দেখেছে। আলাপ হয়েছে। মেলামেশা করেছে দুটি একটি পরিবারের সঙ্গে। বাঙালীর বিয়ে দেখেনি কিন্তু সদ্য বিবাহিতা বাঙালী বউ দেখেছে। ফ্লাইট লেফটন্যান্ট চক্রবর্তীর বিয়ের পর। চক্রবর্তী ওদেরই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ য়্যান্ড স্টাফ ডিউটি ব্রাঞ্চে কাজ করত। এখানে থাকতে থাকতেই বিয়ে হলো। কলকাতায়। তবে বিয়ের ক'দিন পরেই নতুন বৌকে নিয়ে এলো। অফিসার্স ক্লাবের রিসেপশনেও গিয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে দেখেছিল মিসেস চক্রবর্তীকে। নববধূর বেশে দেখে স্তব্ধ হয়েছিল। হয়ত সেইদিনই ও প্রথম স্বপ্ন দেখে···

বিশ্বাস তামসীকে আনমনা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবছ ?'

চোখ দুটো বড় বড় করে তামসী বিশ্বাসের হাতটা চেপে ধরে জবাব দেয়, 'জান, ভাবছি এবার থেকে আমি শাড়ী পরব।'

'হঠাৎ ?'

'হঠাৎ কেন হবে ? সারা দেশের সব মেয়ের মত আমি শাড়ী পরতে পারি না ?'

'নিশ্চয়ই পার।'

বিশ্বাস আর প্রশ্ন করে না। জানে তামসীর মনে একটা ছোট্ট দুঃখ, এক টুকরো অভিমান আছে। ওরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ওরা ক্রিশ্চয়ান। সবাই যেন ওদের ঠিক আপন ভাবতে পারে না। চায় না। সবার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হবার সুযোগ ওদের বড় কম। ওরা যেন শুধু উপহাস আর উপভোগের সামগ্রী। এসব বিশ্বাস জানে। জেনেছে। বুঝেছে। তাইতো চুপ করে থাকে।

'আমি শাড়ী পরলে তোমার আপত্তি নেই তো ?'

'আপত্তি থাকবে কেন ? নিশ্চয়ই শাড়ী পরবে।'

খবরটা অনেক আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা হাকিমপেটের সবাই জানত বিশ্বাস স্পীটফায়ারের পাইলট হলেও এখন সুপারসনিক নিয়ে উড়ছে। ওদের দুজনের আড়ালে কখনও আলোচনা, কখনও সমালোচনা হতো। অফিসে, অফিসার্স ক্লাবে। লাঞ্চ ব্রেকে, সন্ধ্যার পর ড্রিংক করতে করতে। কিন্তু যেদিন মিস ম্যাকডোনাল্ড সত্যি সত্যিই শাড়ী পরে অফিসে

এলো, সেদিন যেন হাকিমপেটে ভূমিকম্প হলো। অফিসে, এয়ারফিল্ডে। সর্বত্র।

মিস গ্রিফিথ ছুটে এসে একবার ওর আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখে নিলো। একটু মুচকি হাসল। উপহাসের হাসি। 'হে। তুমি কি ওয়ার্কিং গার্ল' না নিউলি ম্যারেড ব্রাইড?' মুহূর্তের জন্য একটু থামল। তারপর মিস ম্যাকডোনাল্ডের চিবুক ধরে একটু আদর করে প্রশ্ন করল, কালই বিয়ে হলো?'

দূর থেকে একটু উপভোগ করার পর ছুটে এলো মিস ডীন। কানে কানে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে হনিমুনে যাচ্ছিস?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড হাসতে হাসতে বলিষ্ঠভাবে বল্লো. লুকিয়ে 'লুকিয়ে কিছু করব না। তোরা সব জানতে পারবি।'

মন্তব্য করেছিল আরো অনেকে। কেউ সরস, কেউ নিরস। অফিসাররাও বাদ গেলেন না। ফ্লাইট লেফটন্যান্ট মোদী বল্লো. 'ইউ লুক চার্মিং ইন সারি!'

'থ্যাংক ইউ স্যার!'

অন্যদিন ডাক পড়ে না কিন্তু সেদিন স্কোয়ার্ডন লীডার ভাল্লাও ডাকলেন কি একটা কাজের জন্য। হাজার হোক ওদের বড় সাহেব। প্রথমেই মন্তব্য করতে বোধহয় লজ্জা করল। সামান্য একটু কাজের কথা বলেই বল্লেন, 'শাড়ী পরে কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না?'

'খুব সামান্য তবে দু'একদিনের মধ্যেই অভ্যাস হয়ে যাবে।'

'ইউ থিংক সো?'

'ইয়েস স্যার।'

স্কোয়াড্রন লীডার মুহূর্তের জন্য মিস ম্যাকডোনাল্ডের সর্বাঙ্গের 'পর দিয়ে মিষ্টি দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। 'ইন এনি কেস, ইউ লুক ভেরী হ্যান্ডসাম।'

'থ্যাংক ইউ স্যার!'

স্কোয়াড্রন লীডারের কাছ থেকে ঘুরে এসে আপন মনে কাজ করছে। কয়েক মিনিট পরেই উঠে এলো মিস স্যামুয়েল। ফাইল থেকে মুখ তুলে মিস ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে?'

'বলছিলাম সারি ইজ অলরাইট বাট হোয়াট এ্যাবাউট হেয়ার? মাথায় এইরকম ছোট ছোট চুল নিয়ে শাড়ী পরা কি ভাল দেখাবে?'

'ভেবে দেখব।'

মিস স্যামুয়েল ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি ফুটিয়ে বল্লো, 'সো কাইন্ড অফ ইউ ম্যাম।'

কত আর সহ্য করা যায়? মিস ম্যাকডোনাল্ড সঙ্গে সঙ্গে একটু জোর করেই বলে. 'কারেক্ট ইওর ইংলিশ। আমি ম্যাম নই, মিস।'

সারাদিনই এইভাবে চল্লো। ব্যতিক্রম শুধু মিস পদ্মনাভন। সাবিত্রী পদ্মনাভন আর একটি ছেলে। ওদেরই অফিস কলিগ মিশ্র। সাবিত্রী বল্লো, 'সত্যি আজকে তোমাকে দারুণ লাগছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ডোণ্ট থ্যাঙ্ক মী বরং আমিই তোমাকে ধন্যবাদ জানাব।'

'কেন?'

'তুমি শাড়ী পরেছ বলে।'

তার জন্য ধন্যবাদ জানাবে কেন?'

ইণ্ডিয়ান মেয়েদের শাড়ী পরলেই ভাল লাগে কিন্তু তোমরা পর না। তুমি যে সাহস করে পরেছ তার জন্য আমিই তোমাকে ধন্যবাদ জানাব।'

সারা অফিসের মধ্যে এই একটা মেয়ে ওকে হিংসা করে না, ওকে অপমান করে না, ওর সমালোচনা করে না। বরং আগে ঠিক পছন্দ করত না, যখন লালাগুডার আরো অনেক মেয়ের মত ও অতি সাধারণ মেয়ের মত জীবন-যাপন করত। যখন ও প্রতি সন্ধ্যায় তলিয়ে যেত তখন ওকে সত্যি ভাল লাগত না সাবিত্রীর। পাইলট অফিসার বিশ্বাসের কাহিনী যখন ওর কানে এলো যখন অনেক কিছু শুনল, মিস ম্যাকডোনাল্ডের ক্রম বিবর্তন স্পষ্ট হলো তখন সাবিত্রী স্বেচ্ছায় ওকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। 'আই এ্যাম রিয়েলী ভেরি গ্লাড টু সী ইউ চেঞ্জড্।'

মিস ম্যাকডোনাল্ড প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি, 'তার মানে?'

'তুমি বুঝতে পার না তুমি পাল্টে গেছ?'

'সত্যি বদলে গেছি?'

'একশ' বার। এখন তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় তুমি কত সুখী কত খুশী।'

'আগে কি মনে হতো?'

'মনে হতো পসারিনী। যৌবনের পসারিণী। রোজ সন্ধ্যায় সওদা হতো তোমার ···'

সাবিত্রী কি যেন ভাবছিল। কি যেন বলছিল।

'বল্লে না আগে কি মনে হতো?'

'আগে তোমাকে দেখলেই কষ্ট হতো।'

'কেন? অন্য মেয়েদের দেখে কষ্ট হতো না?'

'না। অন্য মেয়েরা সবাই বড় চীপ। বড় সস্তা। তোমাকে অত সস্তা ভাবতে পারতাম না, কিন্তু তবুও তুমি নিজেকে বড় বেশী সস্তা করে তুলেছিলে।'

অফিসে কথা বলে আরাম হয় না। আশা মেটে না। মন ভরে না। একদিন দুজনে মিলে চলে যায় শহরের বাইরে। গোলকুণ্ডা। গোলকুণ্ডা ফোর্টে। গ্রানাইটের তৈরী বানজারা গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকে ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় নৌ মহলের ধারে। ফুলের বাগানে। প্রাণ খুলে কথা বলে। দুজনেই। মিস ম্যাকডোনাল্ড সব কিছু বলে। অতীত জীবনের গ্লানির কথা। পাইলট অফিসার বিশ্বাসের কথা। 'বিশ্বাস কর সাবিত্রী, অনেক দিন

ধরেই নিজের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত গ্লানি বোধ করছিলাম। অথচ মুক্তি পাবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বিশ্বাসকে না পেলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেত।'

সাবিত্রী তর্ক করে, 'তবে আনন্দে উত্তেজনায় ভেসে যেও না।'

'না, না, তা কখনও হবে না।' একটু থেমে আবার বল্লো, 'একটা কথা বলব বিশ্বাস করবে?'

'করব না কেন?'

'প্রথম দিন রাত্রে ওকে কাছে পেয়েও আমি ভেসে যাইনি। বরং পরিতৃপ্তির আনন্দে সব উত্তেজনা যেন হারিয়ে গিয়েছিল।'

স্যান্ডউইচ খেতে খেতে আরো কত কথা হয়।

সাবিত্রী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, 'বাঙ্গালী বৌদের মত সংসার করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'শাড়ী পরতে অসুবিধা হয় না?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড হাসল। 'সত্যিই প্রথম কদিন দারুণ অসুবিধা হতো। বারবার খুলে যেত…'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি পাঁচ মিনিট পর পরই পেটিকোটে শাড়ী গুঁজতাম।'

'প্রথম প্রথম আমাদেরও খুব অসুবিধা হয়।'

'রিয়েলি?'

সাবিত্রী হাসতে হাসতে বল্লো, 'প্রথম প্রথম শাড়ী পরা শুরু করলে কতদিন আমার শাড়ী খুলে গেছে।'

আঁতকে ওঠে মিস এলিজাবেথ ম্যাকডোনাল্ড, 'সে কি?'

'হ্যাঁ। এতে এত অবাক হচ্ছ কেন? সবারই হয়।'

আরো কত হাসাহাসি। মজার কথা।

শেষে সাবিত্রী একটু সতর্ক করে দেয় ওকে, 'এলিজ! বী কেয়ারফুল, তোমার জন্য যেন বিশ্বাসের জীবনটা, কেরিয়ারটা নষ্ট না হয়।'

'না, না তা কখনই হতে দেব না।'

এই সাবিত্রী ছাড়া আর সবাই ওর সমালোচনা করে, নিন্দা করে। বিশ্বাসকেও বহুজনের টিকা-টিপ্পনী সহ্য করতে হয়। অফিসার্স ক্লাবে সেদিন সন্ধ্যার পর আড্ডা দিতে দিতে ভাল্লা হঠাৎ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করল, 'হাউ ইজ ইউর আনম্যারেড ওয়াইফ?'

বিশ্বাস বোধহয় কিছু সাংঘাতিক মন্তব্য করতে যাচ্ছিল কিন্তু তপন ইসারা করায় কোনমতে নিজেকে সংযত করে বল্লো, এ্যাজ গুড 'এ্যাজ ইওর ওভার ম্যাচিওর্ড সিস্টার।'

শঠে শাঠ্যাং সমাচরেৎ! ভাল্লা কোনমতে হুইস্কীটা গলায় ঢেলে সরে পড়ল।

বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে সমালোচনা আরো বেশী জমে ওঠে। পেগ বয় এসে আরেকবার সবার গেলাস ভরে দিল। কাটারী এক চুমুক খেয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে একটু বেশী সতেজ করে নিয়ে এপাশ ওপাশ দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়ার ইজ দেবানন্দ?'

'দেবানন্দ?' যশোবন্ত অবাক হয়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ দেবানন্দ। আমাদের রোমাণ্টিক হিরোর কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

একসঙ্গে অনেকে হাসল।

'ড্যাম লাকি চ্যাপ! প্রথম পোস্টিং-এই কেল্লা মারল।'

নায়ার বল্লো, 'মিস ম্যাকডোনাল্ডকে দেখতে কিন্তু দারুণ।'

ঠোঁটের কাছ থেকে হুইস্কীর গ্লাসটা নামিয়ে নিয়ে জিভ দিয়ে একটা বিচিত্র আওয়াজ করে ভরদ্বাজ বল্লো, 'ওকে একবার কিস্ করতে পারলে সেদিন আর হুইস্কী খাবার দরকার হবে না।'

'আর যদি এক রাতের জন্য '

তপন বুঝতে পারল না কার গলা, তবে বেশ বুঝতে পারল কি সাংঘাতিক মন্তব্য করতে চলেছে। আর এগুতে দিতে পারল না। বাধা দিল। 'আঃ! কি হচ্ছে।

বাজপেয়ী তপনকে বল্লো, 'তুমি এদের কথায় কান দিও না।'

'তাই বলে একজন কলিগের, ফ্রেণ্ডের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনার একটা লিমিট থাকবে তো?'

তপনকে সবাই ভালবাসে। সঙ্গে সঙ্গে একটু শ্রদ্ধা করে নানা কারণে: ভরদ্বাজ তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললো, 'দাদা, যাস্ট ঠাট্টা করছি। কিছু মনে কোরো না।'

'আমি কি মনে করি সেটা বড় কথা নয়। কোন বন্ধুবান্ধবের অনুপস্থিতিতে এসব আলোচনা করা কি ঠিক?'

'ইউ আর রাইট।'

'তাছাড়া ওই মেয়েটা দুদিন পরে আমাদের বন্ধুর স্ত্রী হতে পারে। দেন হোয়াট সী উইল থিঙ্ক অফ আস?'

বাজপেয়ী রুলিং দিল, 'হ্যাভ জোকস্ কিন্তু ভালগারিটি চলবে না।'

কদিন বাদে এইসব সত্যি সত্যিই মিস্ ম্যাকডোনাল্ডের কানে পেঁছাল। বিশ্বাসও জানতে পারল।

'আচ্ছা পাইলট অফিসার সরকার কি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?' মিস্ ম্যাকডোনাল্ড জানতে চায়।

'ও তপন ? ও সবারই বন্ধু। রিয়েলী গুড চ্যাপ।'

'বরাবরই ● অত্যন্ত সিরিয়াস অথচ হাসি-ঠাট্টা মজা করতেও পারে সমান ভাবে।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। যোধপুরে থাকতে মিসেস মাথুরকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই হতো! তপন ওয়াজ ওনলি একসেপ্শন।'

'কেন ?'

'ও রসিকতা পছন্দ করে কিন্তু কোন মেয়েকে নিয়ে অশ্লীল অমার্জিত আলোচনা মোটেই সহ্য করতে পারে না।'

ক'দিন পরে আবার কথায় কথায় তপনের কথা উঠল।

'আচ্ছা, পাইলট অফিসার সরকার কোন মেয়েকে ভালবাসেন ?'

'না।'

'কেন ?'

বিশ্বাস হাসে। 'ইচ্ছা করলেই কি ভালবাসা যায় ?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড ভাবে কিছুক্ষণ। 'কোন মেয়ের সঙ্গে ওর ভাব-টাব হয়নি ?'

'তেমন কিছু শুনিনি।'

বিশ্বাসের পারিবারিক ইতিহাস মিস ম্যাকডোনাল্ড জানে। জানে ওদের ভাল ব্যবসা আছে কলকাতায়। দাদা বিলেত ঘুরে আসার পর নিজেই ব্যবসা দেখছে। ছোট দু' ভাই পড়াশুনা করছে। দাদার বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক আগে। বৌদি খুব ভাল। বাবা বেশ কৃপণ হলেও বৌদির জন্যই ও দরকার মত দু'পাঁচশ' টাকা পায়। কয়েক মাসের মধ্যেই বৌদির বাচ্চা হবে, সে খবরও জানে। সেদিন বৌদির একটা চিঠি এসেছে। বিশ্বাস পড়ল।···
'সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ খবরটা একেবারে চিঠির শেষে লিখেছ কেন ? এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার তামসীর ছবি পাঠাও। কাউকে বলিনি ভয় নেই।'

'তুমি ওকে আমার কথা লিখেছ ?'

'সামান্য একটু লিখেছি।'

'কি লিখেছিলে ?'

'লিখেছিলাম তামসীর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছে।'

'আর কিছু লেখনি ?'

'না।'

'আর কিছু লিখলে না কেন ?'

'আস্তে আস্তে লিখব। তারপর তপনকে দিয়ে বলাব।'

'কেন ? উনি কি বলবেন ?'

'ডেরাডুনে থাকতে আমরা একসঙ্গে কলকাতা থেকে যাতায়াত করতাম বলে আমাদের বাড়ীর সবাই ওকে চেনে। তপন আমাদের বাড়ীতে দারুণ পপুলার।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাই তো ওকে দিয়েই ফাইন্যাল প্রস্তাবটা পাঠাব।'

'উনি রাজী হবেন?'

বিশ্বাস একটু ভাবল। 'ও যদি বুঝতে পারে আমরা শুধু স্ফূর্তি করার জন্যই মেলামেশা করছি না, তাহলেই বলবে। আদারওয়াইজ নেভার।'

দিন এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলে জীবন। হাকিমপেটের জীবন। স্পীট-ফায়ারের ট্রেনিং। এখন সাতশ' গজে নির্বিবাদে টেক্-অফ্ করে, হাজার-বারোশ' গজে ল্যাণ্ড করে। এখন আর প্রপেলার ব্লেড গ্রাউণ্ড টাচ্ করে না। কম্পাসের রেড-ব্লু নিডল্ ঘুরে যাবার ভয় নেই, ভয় নেই অযথা হয়রানির।

হাকিমপেটের মেয়াদ এক বছরের। সে মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে আসছে। আর তিন মাসও নেই। দীর্ঘ জীবন-মহাসাগরে হাকিমপেট একটা ছোট্ট দ্বীপ মাত্র। সময় দিয়ে যেন জীবনের বিচার হয় না। হতে পারে না। হয় না। এই স্বল্প-পরিসরে কত কি হলো?

'দাদা, চলে যাবার আগে একদিন আমার হাতের রান্না খাবেন?' তামসী তপনকে অনুরোধ করে। নাকি দাবী জানায়?

দাবী জানাবে না কেন? আস্তে আস্তে দাবী জানাবার অধিকার অর্জন করেছে। অফিসার্স ক্লাবের ঘটনা শোনার পর থেকেই উদ্‌গ্রীব হয়েছিল পাইলট অফিসার সরকারের সঙ্গে আলাপ করার জন্য। মন চাইছিল ধন্যবাদ জানাতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে। কিছুদিন পরে একটা সামান্য সুযোগ জুটে গেল। ক্যাজুয়াল লিভের ফাইল দেখতে দেখতে মিস ম্যাকডোনাল্ড দেখল একটা স্টেটমেণ্ট। পাইলট অফিসার সরকারের সই চাই। এক্ষুণি ভীষণ জরুরী। টেলিফোন করল এয়ারপোর্টের ব্রিফিং রুমে। 'এক্সকিউজ মী, আই ওয়াণ্ট পাইলট অফিসার সরকার।

'প্লীজ হোল্ড অন!'

হোল্ডিং।'

কিছুক্ষণ টেলিফোন কানে ধরে রাখার পর শুনতে পেল, 'পাইলট অফিসার সরকার হিয়ার।

'দিস ইজ মিস ম্যাকডোনাল্ড ফ্রম এ এ্যাণ্ড এস-ডি ব্রাঞ্চ।'

তপন চমকে উঠেছিল। এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যাণ্ড স্টাফ-ডিউটি ব্রাঞ্চের মিস ম্যাকডোনাল্ড! বিশ্বাসের তমসী! কোনমতে সামলে নিয়ে জানতে চাইল, 'ইয়েস!'

'আপনার ক্যাজুয়াল লিভ স্টেটমেণ্টে একটা সই চাই। ওগুলো আজই কম্যাণ্ড অফিসে পাঠাতে হবে। সো ডু প্লীজ ড্রপ ইন ফর এ মোমেণ্ট।'

তপন গিয়েছিল। তবে লাণ্ট সার্ট' ফ্লাই করে যেতে যেতে দেরী হয়েছিল। অফিস ছুটির আগে পেঁছিল। হাজির হলো মিস ম্যাকডোনাল্ডের টেবিলের সামনে।

'আই এ্যাম সরি টু বী ডিলেড। অনেক চেষ্টা করেও এর আগে পারলাম না।'

'না, না, ঠিক আছে। ফ্লাইং ছেড়ে আসা কত ডিফিকাল্ট তা আমি জানি।' মিস ম্যাকডোনাল্ড নিজে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্লো, 'বসুন দাদা।'

অবাক হয় তপন। 'হোয়াট ?'

মিস ম্যাকডোনাল্ড হাসতে হাসতে বল্লো, 'দাদা বল্লাম বলে রাগ করলেন ?'

'রাগ করব কেন ? বরং খুশীই হলাম তবে ...'

'তবে কি ?'

'কেউ তো বলে না তাই একটু অবাক হয়েছিলাম।'

সেই শুরু। নতুন অধ্যায়ের সেই যাত্রারম্ভ।

রাত্রে ডিনারের পর তপন বিশ্বাসকে ডাকল। 'জানিস আজ কি হয়েছে ?'

'কি ?'

'অফিসে গিয়েছিলাম লিভ স্টেটমেণ্ট সই করতে ...'

'তাতে কি হলো ?'

তপন হাসতে হাসতে বল্লো, 'কি হয়নি তাই বল! জানিস তোর তামসী হঠাৎ আমাকে দাদা বলে ডাকল।'

বিশ্বাস সত্যি একটু অবাক হলো, 'রিয়েলি ?'

বালিশের পর কনুই ভর দিয়ে কাত হয়ে তপন বললো, 'আমি তো তোদের মত মেয়েদের কথা বাড়িয়ে বলি না।'

'ম্যাটার অফ টু-ডে অর টুমরো। আমরা আজ বাড়িয়ে বলছি, তুই কাল বলবি।'

'বোধহয় সেদিন কোনদিনই আসবে না।'

সিগারেট ধরিয়ে বিশ্বাস প্যাকেটটা ওকে এগিয়ে দিল। 'কেন তুই কি সাধু হবি নাকি ? বিয়ে করবি না ?'

'বিয়ে হয়ত করব তবে তোমাদের মত রহস্যময় নায়ক হতে পারব না।'

'তোর হতে হবে না, তুই অটোমেটিক্যালী হয়ে যাবি।'

হাসি-ঠাট্টার পরে শুরু হয় সমস্যার কথা। সুখের সমস্যা, আনন্দের সমস্যা। বিশ্বাস হয়ত ওসব ভাবে না। ভাবতে চায় না অথবা আনন্দের উত্তেজনায় ভাবার অবকাশ পায়নি। কিন্তু তপন ভাবে। মাঝে মাঝেই ভাবে। তাইতো না জিজ্ঞাসা করে পারল না। 'এখানকার দিন তো প্রায় ফুরিয়ে এলো। কি করবি ঠিক করলি ?'

বিশ্বাস হেসেই উড়িয়ে দিল। 'আগে তুই ওকে দেখ, মেলামেশা কর। তোর ওপিনিয়ন জানি। তারপর বলব।'

তপন অবাক হয়, 'সে কি রে? এখনও কি ওপিনিয়ন দেবার সময় আছে?'

'ডোণ্ট আর্গ্ন্। ডু হোয়াট আই সে।'

'তার মানে?'

'তুই একটু ভালভাবে ওকে দেখ। তারপর বলবি ওকে কেমন লাগলো। ঝোঁকের মাথায় প্রেম করতে পারি কিন্তু নিশ্চয়ই বিয়ে করব না।'

তপন অনেকক্ষণ তর্ক করল। অনেকভাবে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল কিন্তু ফল হলো না। তাছাড়া দিন দুই পরে রুম বয় একটা চিঠি দিল। মিস এলিজাবেথ ম্যাকডোনাল্ডের চিঠি। বিশ্বাসের তামসীর চিঠি। 'দাদা, লালাগুডা রেল কলোনীর মত আমারও বিশেষ সুনাম নেই। কিন্তু এককালে কিছু অন্যায় করেছি বলে কি পরে তার প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না? আপনাকে দাদা বলেই মনে করি। আপনি আমাকে বোন বলে মেনে নিতে পারেন না? পারেন না একবার আমার এই অন্ধকার, নোংরা ঘরে একটু পায়ের ধুলি দিতে? আপনার স্নেহ পেলে হয়ত অনেক গ্লানি আর অসম্মানের হাত থেকে বাঁচতাম।'

ছোট্ট শ্লিপ। ও পাতায় শুধু, উইথ কাইণ্ডেস্ট রিগার্ডস—সিস্টার তামসী।

একটু দ্বিধা যে করেনি, তা নয়। তবু গিয়েছিল। না গিয়ে পারেনি। বিশ্বাসের অনুরোধ, তামসীর চিঠি অগ্রাহ্য করতে পারেনি। তবে আগেই শর্ত করেছিল সন্ধ্যার পর যাবে না। গিয়েছিল রবিবার সকালে।

দরজা খুলেই খুশীতে ঝলমল করে উঠল তামসী, 'তাহলে সত্যি এলেন!'

'আসব না? এমন অনুরোধ করলে কেউ না এসে পারে?'

ঘরে ঢুকেই তপন জিজ্ঞাসা করল, 'বিশ্বাস নেই?'

তামসী হাসতে হাসতে বল্লো, 'আমরা ভাই-বোনে কথা বলব, ওর থাকার কি দরকার?'

তপন হাসল। 'কোথায় বসব?'

'যেখানে খুশী।'

চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। চারপাশ তাকিয়ে দেখছিল।

'কি দেখছেন? দেখার মত কিছু নেই।'

'আপনি নিজেকে এত ছোট ভাবেন কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করল তামসী, 'উঁ' হুঃ। ঐ আপনি চলবে না। তুমি না বল্লে কোন কথার জবাব দেব না।'

একটা একটা করে আরো অনেক দাবী মেনে ছিল তপন। আপত্তি করেছে, যুক্তি দেখিয়েছে কিন্তু ফল হয়নি। কেমন যেন একটা মিষ্টি আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়েছিল তামসীর আলাপে, আচরণে।

'জানেন দাদা, জীবনটাকে উপভোগ করার সুযোগ আমার অনেক, কিন্তু যে জীবনে মনের শান্তি নেই, মর্যাদা নেই, সে জীবন আমি চাই না, আমার ভাল লাগে না।'

তপন অবিশ্বাস করতে পারেনি, সন্দেহ করতে পারেনি ওর এই কথায়। মনের ইচ্ছায়।

'আচ্ছা, তামসী, তুমি এত ভাল বাংলা বলতে এরই মধ্যে শিখতে পারলে?'

'বাঙ্গালীকে বিয়ে করব, আর বাংলা শিখব না?'

'কিন্তু এরই মধ্যে শিখলে কি করে?'

'আমাদের দুজনের আলাপ হবার কয়েক দিনের মধ্যেই ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা পরিষ্কার হয়ে গেল মনের মধ্যে। তারপর থেকে আমরা সব সময় বাংলা বলতাম।' তামসী একটু সলজ্জ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বল্লো, 'তখন এত কথা বলাবলি করতাম যে তাড়াতাড়ি বাংলা শিখতেই হলো।'

'বাংলা লিখতে বা পড়তে পার?'

'না দাদা, একেবারেই পারি না।'

'কেন?'

'প্রথম কথা বই নেই, দ্বিতীয় কথা সময় পাই না।' একটু থামল। 'আপনারা ট্রান্সফার হবার পর শিখে নেবে।'

কথায় কথায় অনেক সময় পার হলো। তপন উঠল, 'এবার উঠছি। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

'আবার আসবেন তো?'

'নিশ্চয়ই আসব।' একটু তৃপ্তিমাখা হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে বল্লো, 'অফিসের পর সন্ধ্যার দিকে চলে আসব, কেমন?'

তামসী দারুণ খুশী হলো।

তপন দরজা দিয়ে বেরুতেই তামসী কেমন যেন একটু দ্বিধা করে বল্লো, 'একটা কথা বলব দাদা?'

'বলো।'

'আমি কোন অন্যায় করছি না তো?'

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বাইবেলের ভাষায় তপন বল্লো, 'ষ্ট্যান্ট ইন অ্যা এ্যান্ড সিন নট; কমিউন উইথ ইওর ওন হার্ট' আপন ইওর বেড, এ্যান্ড বি ষ্টিল।'

॥ চার ॥

দেখতে দেখতে আদমপুরের দিনগুলোও ফুরিয়ে গেল। তপন বিশ্বাস করতে পারে না। অবাক হয়, বিস্মিত হয়। ভাবতে গিয়েও যেন একটু থমকে দাঁড়ায়। মনে হয়, এইত সেদিন এলো। অথচ এরই মধ্যে ন' মাস কেটে গেল? এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল সময়টা? আনন্দের মধ্যেও একটু যেন বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগে তপনের মনে।

এমন হয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই হয়। সবারই হয়। ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার আনন্দ অনেক কিন্তু সে আনন্দের সঙ্গে যেন একটু বিচ্ছেদ-বেদনার রস মিশে থাকে। স্কুল ছেড়ে কলেজে যাবার আনন্দ প্রায় সীমাহীন। তবুও বাল্যবন্ধুদের হারাবার জন্য মনটা একটু বেসুরো হবেই। মেয়েরা ছোট-বেলায় পুতুলের বিয়ে দেয়। বড় হলে বিয়ের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যেদিন সে স্বপ্ন সার্থক হয়, যেদিন লাল বেনারসী পরে প্রথম পতিগৃহে যাত্রা করে সেদিন চোখের জলের বন্যায় ভাসিয়ে যায় সবাইকে। দূরে যাবার জন্যই সবাই ট্রেনে চড়ে কিন্তু তবুও ট্রেন ছাড়ার পরেও প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় সবাইকে। সব কিছু পাবার মধ্যেই যেন কিছু হারানো লুকিয়ে থাকে। এটাই সংসারের নিয়ম।

তবুও তপন ভাবে।

মনে হয় এইত সেদিন হাকিমপেট আদমপুরের ভ্যাম্পায়ার স্কোয়াড্রনে জয়েন করল। ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের প্রথম জেট ফাইটার হচ্ছে এই ভ্যাম্পায়ার। ও সেই ভ্যাম্পায়ার নিয়ে পাগল হয়ে উঠল, মাতাল হয়ে পড়ল। একটা, দুটো, তিনটে চারটে, পাঁচটা সর্টি ফ্লাই করেও মন ভরে না। আরো ফ্লাই করতে চায়। উইং কমাণ্ডার সেনগুপ্ত সতর্ক করে দেন, 'ডোণ্ট্ স্ট্রেন টু মাচ।'

উইং কমাণ্ডারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তপন আশ্বাস দেয়, 'না, না, স্ট্রেন হবে কেন?'

উইং কমাণ্ডার হাসতে হাসতে বলেন, 'ইয়ং বয়! জেট ফাইটার অনেকটা নটি ইয়ং গার্লের মত! বি কেয়ারফুল।'

তপন কোন জবাব দেয় না। মাথাটা একটু নিচু করে হাসে। 'একটু মিস-ক্যালকুলেশন হলেই সিরিয়াস বিপদের সম্ভাবনা। বি ভেরী কেয়ারফুল।'

'ইয়েস স্যার!'

'তাছাড়া ফাইটার পাইলটের পক্ষে কোন কারণেই উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয়।'

দু'একদিন পরেই ভ্যাম্পায়ার স্কোয়াড্রন পাইলটদের ব্রিফ করার সময় উইং কমাণ্ডার সেনগুপ্ত এক ঝলক তপনকে দেখে বল্লেন, 'আই নো ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের প্রথম জেট ফাইটার হাতে পেয়ে তোমরা অনেকেই খুব একসাইটেড্

হয়ে পড়েছ। বাট ফর গডস্ সেক্ উত্তেজিত হবে না। ভ্যাম্পায়ার অত্যন্ত মডার্ণ ও সফিসটিকেটেড ফাইটার।'

তারপর আরেকবার ভ্যাম্পায়ারের আধুনিকতা মনে করিয়ে দিলেন। স্পীড সাড়ে চারশ নট্ পার আওয়ার। ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশ মাইল। টেক অফ এর জন্য চাই এক হাজার গজ আর ল্যাণ্ডি-এর জন্য দেড় হাজার গজ রানওয়ে। টোয়েণ্টি এম. এস. চারটি কামান ছাড়াও ভ্যাম্পায়ারে আটটি আনগাইডেড রকেট থাকে।

'নো জোক মাই বয়েজ!' মাঝপথে একবার গম্ভীর হয়ে উইং কমাণ্ডার মন্তব্য করলেন।

পঁচিশ পাউণ্ডার অথবা ষাট পাউণ্ডার এক্সপ্লোসিভ হেড-এর ব্রিটিশ তিন ইঞ্চি রকেট অথবা পনের কিলো হেড-এর ফ্রেঞ্চ টি-টেন রকেট এই ভ্যাম্পায়ারে থাকতে পারে। এমন একটা রকেট দিয়ে একটা ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা সম্ভব। রিয়েলি নো জোক।

তপন ভাবে এইত সেদিনের কথা! অথচ কতদিন হয়ে গেল।

কিছুদিন পর ওয়েস্টার্ণ কমাণ্ডের এয়ার অফিসার কমাডিং ইন চীফ্ এলেন ভ্যাম্পায়ার স্কোয়াড্রনের ডিমনোস্ট্রেশন দেখতে। খুশী হলেন। স্টেশন কমাণ্ডারের ঘরে পাইলটদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার শেষে এ-ও-সি মন্তব্য করলেন, আই থিংক ইউ অল ডিজার্ভ এ গুড ডিনার এ্যাণ্ড ব্যাড ড্রিংকস।'

এ-ও-সি'র মন্তব্যে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

এই ডিনারেই শান্তা বৌদির সঙ্গে তপনের আলাপ হলো। ভীড়ের মধ্যে থেকে তপনকে টেনে এনে উইং কমাণ্ডার আলাপ করিয়ে দিলেন, 'মীট মাই ওয়াইফ শান্তা।' এইটুকু বলেই উইং কমাণ্ডার উধাও হয়ে গেলেন।

হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বল্লো, 'আমি পাইলট অফিসার তপন সরকার।'

শান্তা বৌদি হাসতে হাসতে বল্লেন, 'আমি আপনাকে চিনি।'

তপন অবাক হয়, 'সে কি? কোথায় আলাপ হয়েছে বলুন তো!'

'আলাপ হয়নি তবে…'

'তবে চিনলেন কি করে?'

'চাক্ষুস পরিচয় না থাকলেও চেনা যায়।' মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতেই শান্তা বৌদি বল্লেন, 'রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না বলে কি তাঁদের আমি চিনি না?'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তপন বল্লো, 'মাই গড! আপনি তো -'

উইং কমাণ্ডার হঠাৎ আবার দুজনের মাঝে হাজির হয়ে মন্তব্য করলেন, 'সী ইজ ইউনিক! শান্তা অনন্যা। ..'

'আঃ! কি হচ্ছে!'

শান্তা বৌদির শাসন অমান্য করে উইং কমাণ্ডার আবার বল্লেন, 'দারুণ গান গাইতে পারে…'

শান্তা বৌদি শাসন করার আগেই উইং কমাণ্ডার ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

তপনের জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় রাত্রি! এই আলাপের পরেই ওর জীবনধারা বদলে গেল। আগে বড় একঘেয়ে লাগত। ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে সাতটায় রওনা দিতে হয়। সাড়ে সাতটায় এয়ারফিল্ড পৌঁছান। এক কাপ চা। তারপর ব্রীফিং। এক সর্টি ফ্লাইং। তারপর অফিসেই ব্রেক ফাস্ট। আবার এক সর্টি ফ্লাইং। চা। ফ্লাই…। বেলা দেড়টায় প্যাক আপ। মেসে ফিরে বিয়ার। লাঞ্চ। একটু বিশ্রাম। বিকেলে চা খেয়ে একটু বেড়ান। মাঝে মাঝে টুয়েলভ বোর বন্দুক নিয়ে তিতির পাখি বা বুনো শুয়োর শিকার। সন্ধ্যার পর তাস অথবা হুইস্কী।

প্রথম প্রথম কিছুদিন ভাল লাগত। তারপর বড় একঘেয়ে মনে হতো তপনের। তাছাড়া তখনও অফিসার্স মেস তৈরী হয়নি। জুনিয়র অফিসারদের তাঁবুতেই থাকতে হতো। এক একটা তাঁবুতে ওরা চারজন করে থাকত। সব মিলিয়ে আদমপুরের জীবন খুব সুখকর ছিল না। তাইতো শান্তা বৌদির সঙ্গে আলাপ হবার পর তপন নতুন আনন্দের অনুভূতিতে ভরে গেল।

শান্তাবৌদিকে ভাল লাগার আর একটা কারণ ছিল। শান্তা বৌদির নেমন্তন্ন খাবার পরদিনই তপন প্রমোশন পেল। পাইলট অফিসার তপন এবার হলো ফ্লাইং অফিসার। খবরটা পাবার পরই আনন্দে একটু উত্তেজিত না হয়ে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছিল বৌদির কাছে।

'বৌদি, আপনার রান্না খাবার পরই আজ প্রমোশন পেলাম।'

'কনগ্রাচুলেশনস্! প্রমোশন পাবার জন্য আজ তাহলে তোমাকে আবার ডিনার খাওয়াবো। আসবে তো?'

'শুধু ডিনার?'

'আর কি চাই? ড্রিংকস?'

'না, না, ড্রিংকস্ না। গান শোনাবেন না?'

'সত্যি গান শুনতে চাও?'

'নিশ্চয়ই।'

'অনেক দিন যে অভ্যাস নেই ভাই!'

'তাতে কিছু হবে না।'

'বেশ শোনাব।'

অফিসারের অবর্তমানে অফিসার্স কোয়ার্টারে যাবার নিয়ম নেই এয়ার ফোর্সে। এতক্ষণে তা মনে পড়ল। 'উইং কমাণ্ডার কোয়ার্টারে নেই তবুও আনন্দে আপনার কাছে না এসে পারলাম না। কিছু…'

'পাগল নাকি ? আমি তো অফিসার নই, আমি তোমার বৌদি। যখন ইচ্ছে তখন আসবে।'

আদমপুর ছাড়ার আগে দিনের আলোর মত স্পষ্ট মনে পড়ছে এইসব ইতিহাস। প্রতিদিনের ইতিহাস। খুঁটিনাটি সব কিছু।

'তপন, ভাই একটা কাজ করে দেবে ?'

'আপনার কোন হুকুম আমি তামিল করি না বলুন তো !'

'আমি কি তাই বলেছি ?'

'বলুন কি করতে হবে।

'সামনের মাসের পাঁচ তারিখে ওর জন্মদিন '

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। তুমি একটু জলন্ধর যেতে পারবে ?'

কথাটা শুনেই তপন হেসে ওঠে, 'জলন্ধর ! আপনার ভূমিকা শুনে মনে হয়েছিল মাদ্রাজ বা ত্রিবান্দ্রম যেতে হবে।'

শান্তাবৌদি কফি এগিয়ে দিতে দিতে একটু হাসলেন। 'ওর একটা স্যুট বানাতে হবে।'

'আপনিও যাবেন তো ?'

'না ভাই আমি যাব না। আমি জলন্ধর গেলেই ও সন্দেহ করবে।'

'আপনি না গেলে কে পছন্দ করবে ?'

'কেন ? তুমি।'

'সেটা কি ঠিক হবে ?'

'খুব ঠিক হবে।'

উইং কমান্ডারের একটা পুরাণ স্যুট নিয়ে গিয়ে জলন্ধর রোনক বাজারের মডার্ণ টেলর্সে নতুন করে স্যুটের অর্ডার দিল ; আবার নিয়ে এলো। জন্মদিনের সন্ধ্যায় শান্তাবৌদির প্রেজেনটেশন পেয়ে চমকে উঠলেন উইং কমান্ডার, 'একি ? কবে তৈরী করালে ?'

শান্তাবৌদি হাসতে হাসতে বল্লেন, 'আমাকে যতটা অকর্মণ্য তুমি ভাব, আমি তা নই।

'বাট…'

'বাট কি ?'

'যেদিন জলন্ধর গিয়েছিলাম সেদিন তো অর্ডার দাওনি।'

'না দিইনি।'

উইং কমান্ডারের বিস্ময় তখনো কাটেনি, 'তারপর তো তুমি আর জলন্ধর যাওনি।'

'না যাইনি।'

'তবে

'তুমি আমার কথা শোন না বলে কি কেউই শোনে না?'

এতক্ষণে তপনের দিকে নজর পড়ল উইং কমাণ্ডারের। মন্তব্য করলেন, 'একজন সুপিরিয়র অফিসারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে একটুও দ্বিধা হলো না?'

তপনকে উত্তর দিতে হলো না। উত্তর দিলেন শান্তাবৌদি, 'অবাধ্য স্বামী পেয়েছি বলে কি দেবরও অবাধ্য হবে?'

বেশ কাটত দিনগুলো। কোন শূন্যতা অনুভব করত না তপন।

'তপন, ভাই কালকে কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'কি করতে হবে?'

'মিতুলের একটা সোয়েটার পাঠাতে হবে। এখন পাঠালে ঠিক ওর জন্মদিনের আগে পেঁছিবে।

'পার্শেল করে পাঠাব?'

'হ্যাঁ। তবে একটু ভাল করে প্যাক করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

মিতুল! প্রথম দিন নামটা শুনেই তপনের ভীষণ ভাল লেগেছিল। বলেছিল, 'নামটা শুনেই মনে হয় মিষ্টি একটা আদুরে মেয়ে। বড় বড় চোখ, ঘন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফোলা ফোলা গাল। দেখলেই মনে হয় কোলে তুলে নিয়ে চটকে দিই।'

শান্তাবৌদি শুধু হাসছিলেন।

'তাই না বৌদি?'

'হ্যাঁ। মিতুল ভারী মিষ্টি হয়েছে।'

'ওকে ছেড়ে থাকতে আপনার কষ্ট হয় না?'

'প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত কিন্তু কি করব বল? আমাদের সঙ্গে এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তো ওর পড়াশুনা হবে না। তাই বাধ্য হয়েই কলকাতায় বাবা মা'র কাছে রেখেছি।

'মিতুলকে কি আপনার মা-ই দেখাশুনা করেন?'

'না, না, ওকে এ্যাকচুয়ালি আমার ছোট বোনই দেখাশুনা করে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। সীতা ওকে দারুণ ভালবাসে।'

'আপনার বোনের নাম বুঝি সীতা?'

'হ্যাঁ।'

সেদিন আর কথা হয় না। মিতুল থেকে সীতার প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। তপনের দ্বিধা আসে। শান্তাবৌদির মত সীতাকেও নিশ্চয়ই দেখতে ভাল। হয়ত আরো সুন্দরী। হয়ত খুব ভাল গান গাইতে পারে। হয়ত ··

আপন মনেই মনের মধ্যে একটা ছবি ফুটে ওঠে। তাঁবুতে শুয়ে আকাশ

দেখতে দেখতে তপন না ভেবে পারে না। ভাবতে ভাল লাগে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ লজ্জায় সারা মুখটা রক্তিম হয়ে ওঠে। চোরের মত চুরি করে সীতার কথা ভাবে, লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবে।

হঠাৎ একদিন আরোরার কাছে ধরা পড়ে। 'সরকার, তোমার কি হয়েছে বলো তো।'

উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে তপন, 'কই? কিছু না তো।'

'কিছু না তো বুঝলাম কিন্তু তোমার মুখে এত হাসি কেন?'

'না, না, হাসছি নাকি?'

'সেটাও বুঝতে পারছ না? দেন সিচুয়েশন ইজ রিয়েলি ভেরী ইন্টারেস্টিং।'

আদমপুর ছাড়ার আগে প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের কথা নতুন করে মনে পড়েছে তপনের। যোধপুর হাকিমপেটের কথাও মনে আছে। মনে পড়ে ভাল লাগে ডেরাডুনের স্মৃতি রোমন্থন করতে কিন্তু আদমপুর যেন স্বতন্ত্র। নতুন অনুভূতি নতুন সত্তা।

ফ্লাইং-এর পর প্যাক আপ করার সময় উইং কমাণ্ডার সেনগুপ্ত তপনকে ডেকে বল্লেন, কি ব্যাপার? তুমি নাকি অনেক দিন যাও না?'

তপন হেসে ফেলে। 'অনেক দিন কোথায়? চার-পাঁচ দিন যেতে পারিনি।'

আজ আসছ তো?'

'হ্যাঁ আসব।'

'হ্যাঁ এসো। মিতুলের জন্মদিনের ছবি এসেছে। তোমাকে দেখাবে বলে শান্তা তোমাকে যেতে বলেছে।'

শুধু মিতুলের ছবি এসেছে? নাকি সীতারও? তপন নিজের মনকেই প্রশ্ন করে। নিজেই উত্তর দেয়, একা মিতুলের ছবি নিশ্চয়ই আসেনি। আসতে পারে না। মিতুলের সঙ্গে ওর দাদু দিদা আর মাসীর ছবিও থাকবেই। না থেকে পারে না।

শত সহস্র কোটি মাইল দূরের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে আর এই মাটির পৃথিবীর গঙ্গা-যমুনায় আসে জোয়ার। হঠাৎ ভাবলে বিশ্বাস করতে পারা যায় না। আশ্চর্য লাগলেও সত্যি। এমন হয়। কলকাতার সীতা তপনের মনেও জোয়ার আনে।

লাঞ্চের পর তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে তপন নিজেই অবাক হয়। এমন তো কোনদিন হয়নি। অল্প হলেও ডেরাডুনে, যোধপুরে, হাকিমপেটে কিছু মেয়ের সঙ্গে মেলামেলশা করেছে। সহজ সরলভাবে মেলামেশা করেছে। সাধারণ পরিচিতের মত মিশেছে। কাউকে ভাল লেগেছে, কাউকে ভাল লাগেনি। দু'একজনের কথা আজও মনে পড়ে। মনে পড়লে হয়ত ভাল লাগে কিন্তু এমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেনি। কোনদিন না। এমন কি ময়নার জন্যও না।

ময়না !

তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতেই তপন হাসে। হাসি পায়। এমন কিছু না। সামান্য পরিচয়, দু'একটি কথাবার্তা। একটু হাসি। একটু তির্যক দৃষ্টিতে দেখা। ছুটোছুটি করতে গিয়ে হয়ত বা একটু ধাক্কাধাক্কি। ছোট্ট দুর্গা মণ্ডপে পুজোর সময় ভীড়ের মধ্যে এমন হওয়া স্বাভাবিক। হামেশাই হয়। তবুও ডেরাডুন ন্যাশন্যাল ডিফেন্স একাডেমীর ক্যাডেটদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছিল।

তপন হাসে।

বহুদিন পর ময়নার কথা মনে পড়ায় হাসি পেল। পাবে না ?

এন-ডি-এ থেকে ওরা দল বেঁধে অঞ্জলি দিতে গিয়েছিল দুর্গা বাড়ীতে। ঐ গলির মধ্যে ছোট্ট মণ্ডপ আর একটু ঘেরা জায়গা। দুর্গা মণ্ডপের পাশেই বাংলা বইয়ের লাইব্রেরী। ডেরাডুন শহরের মধ্যে বাঙ্গালীর একমাত্র নিজস্ব জায়গা। দুর্গা পুজোয় বেশ ভীড় হয়। সামনের দিকে মেয়েদের ভীড়, পিছনে পুরুষদের। এন-ডি-এ'র ওরা কোনমতে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ভীড়ের মধ্যে অঞ্জলির ফুলবেলপাতা ছুঁড়তে গিয়ে তপন একটু ধাক্কা খায়। ফুলবেলপাতা দেবীর চরণে না পড়ে ···

সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য, 'কিরে! তুই কিরে! তুই কি দুর্গার নাম করে ময়না চৌধুরীকে অঞ্জলি দিতে এসেছিল ?'

কথাটা শুধু তপনের নয়, ময়নার কানেও পৌঁছেছিল। এই ছোট্ট মন্তব্যের বীজ দুর্গাবাড়ীর অনুকূল আবহাওয়ায় বেশ চটপট অঙ্কুরিত হলো। ময়নার হাত থেকে প্রসাদ নিতে গিয়ে একটু স্পর্শ, একটু মিষ্টি হাসি। সন্ধ্যার পর থিয়েটার-গানবাজনার আগে-পরে সামান্য দুটি-একটি কথা।

শুয়ে শুয়ে হাসতে হাসতে তপন ভাবে, কই, সেদিনও তো এমন বিচিত্র অনুভূতির রসে মদির হয়ে ওঠেনি ?

সীতা! নামটি কি মিষ্টি! তাই না ? নামটা শুনেই মনে হয় একেবারে সাধারণ মেয়ে নয়। একটু স্বতন্ত্র, একটু আলাদা! অনন্যা! ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার মেয়ে নয় সে। একেবারে সাধারণ মেয়ে হলে কি মিতুলকে রাখতে পারত ? অসম্ভব।

আচ্ছা পুজোর ছুটিতে মিতুল আসবে না ? নিশ্চয়ই আসবে। কলকাতার স্কুল-কলেজ তো পুজোর সময় অনেক দিন বন্ধ থাকে। তখন ও কলকাতায় থেকে কি করবে ? মিতুল না থাকলে অত বড় ছুটি সীতাই বা কাটাবে কেমন করে ? মিতুলের সঙ্গে সীতাও আসবে। হয়ত শান্তাবৌদির বাবা-মা ও আসবেন। আসুন। তাতে ক্ষতি কি ? তবু তো দেখা হবে, আলাপ হবে। হয়ত······

আর ভাবতে পারে না তপন। থমকে দাঁড়ায়। ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। কোন

অর্থ হয় এসব ভাবনা-চিন্তার ? কোন মেয়েকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তো এমন করে ভাবেনি, তবে আজকে ভাবছে কেন ? কি প্রয়োজন ? কি কারণ ? কোন অধিকার ?

আরো অনেকক্ষণ ভেবেও কোন জবাব পায় না। বীজ না ছড়ালেও বর্ষার পর শুকনো রুক্ষ প্রান্তরেও সবুজের ছোঁয়া লাগে। লাগবেই। রুক্ষ পৃথিবীর বুকেও নতুন জীবনের বীজ লুকিয়ে থাকে। ছড়িয়ে থাকে। বর্ষার স্নেহে তারা বেঁচে পঠে, আত্মপ্রকাশ করে। তপন ঠিক তা বুঝতে পারে না।

এতসব ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে উঠেছিল তপনের। আস্তে আস্তে একটু একটু করে পাতা গুলো বুজে এসেছিল। সামান্য একটু তন্দ্রা। সেই তন্দ্রা যখন ভাঙল তখন দিনের আলো ফুরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। উইং কমাণ্ডার সেনগুপ্তকে কথা দিয়েছিল তাড়াতাড়ি যাবে। তা আর হলো না কিন্তু আর দেরী করল না।

শান্তাবৌদি দরজা খুলে দিতে দিতে অভিযোগ করলেন, 'এই তোমার তাড়াতাড়ি আসা ?'

তপন অপরাধ স্বীকার করে, 'স্যরি ! একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তাছাড়া এতদিন ডুব দিয়েছিলে কোথায় ?

'এই, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম।'

'বান্ধব না বান্ধবী ?

তপন হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'আপনিই আমার প্রথম ও একমাত্র বান্ধবী।'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মিসেস সেনগুপ্তা বল্লেন, 'হয়ত, কিন্তু আমার বন্ধুত্বের মেয়াদ তো বেশী নয়।'

সত্যিই একটু চমকে ওঠে তপন, 'কেন ?

'বিবাহিতা দিদি-বৌদির সঙ্গে বন্ধুত্ব কি দীর্ঘস্থায়ী হয় ?'

'হয় না ?'

'না।'

'সবার বেলাতেই কি একথা খাটে ?

শান্তাবৌদির সঙ্গে তপনের এমন ছোটখাট কথা কাটাকাটি প্রায়ই হয়। তপন খেতে বসলেই ঝাল দেওয়া নিয়ে এক ইনিংস তর্ক হবেই। উইং কমাণ্ডার মাংসের ঝোল দিয়ে খেতে খেতেই একবার তপনকে দেখে নিলেন। বল্লেন, 'কি ? ঝাল লাগছে ?'

'সামান্য একটু।'

এবার শান্তাবৌদির পালা, 'হা ভগবান। আজকেও ঝাল লাগছে ?

তখন কিছু বলার আগেই উইং কমাণ্ডার বল্লেন, 'না লাগলে বলবে কেন ?, তুমি একটু ঝাল কম দিলেই পার।'

শাস্তাবৌদি এবার স্বামীকে শাসন না করে পারেন না, 'তুমি চুপ কর।' এবার তপনের দিকে ফিরে বল্লেন, বিয়ের আগে কোন ছেলেই ঝাল খেতে পারে না কিন্তু······

'কিন্তু কি ?

'বিয়ের পর বউয়ের রান্নায় একটুও ঝাল লাগে না।'

তপন মুখে কিছু বলে না, শুধু ইসারায় উইং কমাণ্ডারকে দেখায়।

শাস্তাবৌদি হাসতে হাসতে বলে ফেল্লেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঁরও এই বাতিক ছিল।

সারা আদমপুর এয়ার ফোর্স ষ্টেশনে তখন তৃতীয় কোন বাঙালী না থাকায় ওদের সম্পর্কটা বড় বেশী নিবিড় হয়েছিল। না হয়ে উপায় ছিল না। উইং কমাণ্ডারকে অফিসের কাজে বড় বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়। সবার ছুটি হয় দেড়টায়। ওর বাড়ী আসতে আসতে ছ'টা সাড়ে ছ'টা। কোনদিন আরো দেরী হয়। বাড়ীতে এসেও কি মুক্তি আছে? স্টাডিতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হয়। রোজ নয় কিন্তু প্রায়ই। তারপর বাইরে যাওয়া তো লেগেই আছে। শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, আম্বালা, দিল্লী। কখনও কখনও হয়ত আগ্রা বা পুণা বা হাকিমপেট। সাধারণতঃ সকালে গিয়ে সন্ধ্যার পর প্রত্যাবর্তন। তবে ব্যতিক্রম লেগেই আছে।

'হ্যালো শাস্তা, কিছুতেই আজ কাজ শেষ করতে পারলাম না···'

নির্লিপ্ত হয়ে মিসেস সেনগুপ্ত জবাব দেন, 'তা আমি জানতাম।'

'না, না, বিশ্বাস কর এয়ার কমোডর ভার্মার আসতে আসতেই এত দেরী হয়ে গেল যে···'

'তা এত করে বলছ কেন ?

'তুমি রাগ করছ ?'

'রাগ করব কেন ?'

'তোমার কথা শুনেই মনে হচ্ছে তুমি ভীষণ রাগ করেছ ?'

'এতে রাগ করার কি আছে ?'

'দিল্লী ওয়েদার ওয়াজ ভেরী ব্যাড দিস মর্নিং। সেজন্য এয়ার কমোডরের এয়ারক্রাফট্ টেক অফ্ করতে পারেনি বলে······'

এসব এত স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে মিসেস সেনগুপ্তা সত্যি রাগ করেন না। রাগ করতে পারেন না। আজ নয়, এর আগেও রাগ করতেন না।

স্ত্রীর সামান্য মান-অভিমানের জন্য যদি ওদের মন চঞ্চল থাকে, যদি মনে শান্তি না থাকে, মন যদি মুহূর্তের জন্য আনমনা, অন্যমনস্ক হয়, যদি তার জন্য কোন ভুল হয় ? তাহলে ?

মুহূর্তের মধ্যে অভাবনীয় সর্বনাশ পর্যন্ত হতে পারে।

না, না, কোন অফিসারের স্ত্রীই তা ভাবতে পারেন না। উইং কমাণ্ডারের

মন বিক্ষুব্ধ হয় এমন কাজ শান্তা বৌদি কোনদিন করেন নি। করেন না করবেন না। এখন তো অভ্যাস হয়ে গেছে।

মনটা একটু বিমর্ষ হলেও শান্তা বৌদি তাড়াতাড়ি সহজ হবার চেষ্টা করেন, 'খাওয়া-দাওয়া করার সময় পেয়েছিলে তো ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেভিড থাকতে খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত হবে না ?'

'যশোদা ফিরে এসেছে, নাকি রেভিড একলাই আছে ?'

'যশোদা লাস্ট উইকে ফিরে এসেছে।'

'তুমি কি রেভিডর কোয়ার্টার থেকেই কথা বলছ ?'

'হ্যাঁ।

'একটু যশোদাকে দাও তো !'

এইভাবেই দিন কাটে। তারপর মিতুল নেই। মিসেস সেনগুপ্তা মাঝে মাঝে কলকাতা যেতে পারলেও যান না। উইং কমান্ডারকে একলা রেখে যান না। যেতে ইচ্ছে করে না, মন চায় না। তবু দু'একবার যেতে হয়েছে। যেতে হয়। নানা কারণে যেতে হয়। তবে বেশী দিনের জন্য নয়। তাড়াতাড়িই ফিরে আসেন নিজের সংসারে।

তপন সোফায় বসল। শান্তা বৌদি বল্লেন, 'জান তপন, তোমার দাদা কি বলেন ?'

'কি বলেন ?'

'বলেন, তপন না এলে অস্বস্তিবোধ কর, অথচ এলেও ঝগড়া কর।'

'ঝগড়া ?' তপন শুধু হাসল।

শান্তা বৌদি আবার বললেন, 'আমি কি বল্লাম জান ?'

'কি ?'

বললাম, 'সারা দিনই তো কথাবার্তা না বলে কাটাই। তাই তপনের সঙ্গে একটু ঝগড়া করলে চটপট অনেক কথা বলা যায়। মনটা একটু হালকা হয়।'

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

'দাদা কোথায় ?'

'গ্রুপ ক্যাপ্টেন মেটা আর উনি একটু মোটর মেকানিকের কাছে গেলেন।'

'কেন ?'

'আমাদের গাড়ির ফুয়েল পাম্প ঠিক কাজ করছে না। তাই গাড়ীটা দিতে গেলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেনের গাড়ীটাও বুঝি ট্রাবল দিচ্ছে।'

এবার উনি বুক র‍্যাক থেকে ছবির প্যাকেটটা এনে তপনের হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি দেখ আমি চা আনছি।'

মিতুলের ছবি এ বাড়ীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। নানা বয়সের, নানা ভঙ্গিমার। এই ছবিগুলো দেখে মনে হয় ও আর একটু বড় হয়েছে। চোখমুখ

যেন আরো একটু উজ্জ্বল হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। ছবি দেখেই সীতাকে চিনতে পারল। হাজার হোক শান্তাবৌদির বোন তো! না চেনার কোন কারণ নেই। বাঃ! বেশ দেখতে। চঞ্চল না হলেও মুগ্ধ হয়ে দেখে সীতার ছবি। না দেখে পারে না। টল টল করছে মুখখানা। দেখলেই মনে হয় খুব আদুরে। গাল দুটো টিপে দিতে ইচ্ছে করে।

ট্রে'তে দু'কাপ চা আর এক প্লেট চীজ পাকৌড়া নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে শান্তাবৌদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছবিগুলো দেখলে!'

'হ্যাঁ।'

'বাবা-মা আর সীতাকে চিনতে পারলে?' সেণ্টার টেবিলে ট্রে নামাতে নামাতে জানতে চাইলেন।

'লোকেশান্ বা ডেসক্রিপ্সন জানলে ফাইটার পাইলট সব কিছু খুঁজে বের করতে পারে।'

'তাই নাকি?'

'তবে কি?'

চোখ দুটো বড় বড় করে শান্তাবৌদিকে বললেন, 'এবার তো ওদের আসার সময় হয়ে গেল।'

শুনে দারুণ খুশী হয় তপন, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। আর আঠারো দিন বাকি।'

জানতে ইচ্ছা করে কে কে আসছেন কিন্তু লজ্জায় পারে না। একটু ঘুরিয়ে জানতে চায়, 'মিতুলের ছুটি হলে বুঝি ওরা সবাই আপনার কাছে আসেন?'

চা আর চীজ্ পাকৌড়া খেতে খেতেই কথা হয়।

'না, না, সবাই কোথায়? সীতা আর মিতুল আসে! তাও গত পুজোয় সীতা আসতে পারল না বলে আমি গিয়ে মিতুলকে নিয়ে আসি।'

'এবার তো সবাই আসছেন?'

'আমার মার শরীর তো ভাল না। তাই বাবা-মার আসা হয় না।'

'মিতুল আর ওর মাসী আসছে?'

'হ্যাঁ।'

আদমপুর ছাড়ার আগে সব কিছু মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ওদের দুজনের আসার কথা। সীতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা।

উইং কমাণ্ডার হাসতে হাসতে ডাক দিলেন, 'ছোট বৌ, শুনে যাও।'

সীতা এলো কিন্তু বিনা প্রতিবাদে নয়, 'আচ্ছা, ইয়ং মেয়ে দেখলেই কি আপনার শুধু বৌ করতেই ইচ্ছে করে?'

'অফ্ কোর্স!'

শান্তাবৌদির দিকে তাকিয়ে বল্লো, 'হ্যাঁরে দিদি, জামাইবাবুর মধ্যে আদিম প্রবৃত্তিগুলো বেশ প্রবল, তাই নারে?'

শান্তাবৌদি কিছু বলার আগেই উইং কমাণ্ডার বল্লেন, 'তুমি তার পরিচয় চাও ?'

তপন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিট মিট করে হাসে।

'জিভ কেটে দেব।' সীতা বল্লো।

তারপর হলো তপনের সঙ্গে পরিচয়। উইং কমাণ্ডারই পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ফ্লাইং অফিসার তপন সরকার।'

তপন হাত তুলে নমস্কার করল।

সীতাও প্রতি নমস্কার করল আর বল্লো, 'আপনিই তো দিদির প্রাইভেট সেক্রেটারী, তাই না ?'

তপন শুধু বল্লো, 'আপনি সেসব খবরও রাখেন ?'

'না রেখে উপায় আছে নাকি ?... '

'কেন ?'

'আজকাল দিদির চিঠি মানেই তো জামাইবাবুর ট্যুর প্রোগ্রাম আর আপনার সঙ্গে আড্ডা দেবার খবর।'

'আই এ্যাম সরি। আমার জন্য তাহলে আপনাকে অনেক বিরক্তি ভোগ করতে হয়েছে।'

টিপ্পনী কাটলেন উইং কমাণ্ডার, 'ইয়ং হ্যাণ্ডসাম ছেলের খবর শুনতে কোন মেয়ে বিরক্তবোধ করে।'

সীতা শান্তাবৌদির দিকে ফিরে বল্লো, দেখছিস দিদি, জামাইবাবু কি রকম প্রিমিটিভ্।'

শুরু হয়েছিল এইভাবেই। তারপর আস্তে আস্তে দুজনেই সহজ হয়েছিল। কোনদিন উইনিং কমাণ্ডারকে নিয়ে কোনদিন ওকে ছাড়াই ওদের আড্ডা বসত। কোনদিন ড্রইং রুমে, কোনদিন ডাইং টেবিলের চারপাশে বসে। আড্ডা বসত সামনের বারান্দায় আর লনেও। মিতুল আপন মনে খেলত, বসত, ঘুরে বেড়াত। নয়ত এর-ওর বাড়ীতে যেত। কত কি নিয়ে ওদের গল্প হতো। দু'তিন দিন শুধু ওরা দুজনে গল্প করেছে। উইং কমাণ্ডার আর শান্তাবৌদি অফিসিয়াল কক্‌টেল বা ডিনারে গেলে ওরা দুজনেই গল্প করেছে।

'আপনাদের মেস বুঝি অনেক দূরে ?' সীতা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। খানিকটা দূরে। ছাদে উঠে ডানদিকে খুব দূরে যে তাঁবুগুলো দেখতে পাবেন, ঐগুলোতেই আমরা থাকি।'

'আপনারা তাঁবুতে থাকেন ?' অবাক হয় সীতা।

'হ্যাঁ।'

'শ্রীকান্তের মত তাঁবুতে থাকতে নিশ্চয়ই খুব মজা হয় ?' হাসি চাপতে চাপতে সীতা জানতে চাইল।

তপনের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'কিন্তু রাজলক্ষ্মী পাচ্ছি কোথায় ?'

বলতে চায়নি কিন্তু তবু বল্লো। মনের মধ্যে যা চাপা রাখতে চেয়েছিল তা নেহাতই ফসকে বেরিয়ে গেল। আপনা মনে সহজ হয়েই বেরিয়ে গেল। কথাটা বলার পরই ভীষণ লজ্জা পেল। সংকোচবোধ করল। মুখটা বোধহয় লাল হয়ে উঠল।

তপন লজ্জা পেলেও সীতা কিন্তু বেশ উপভোগ করল মন্তব্যটাকে। বললো 'কালো মেঘ দেখে বুঝা কঠিন, ওর মধ্যে বিদ্যুৎ লুকিয়ে থাকে। ঠিক তেমনি আপনাকে দেখেও বুঝা যায় না আপনি এত রসিক।'

'সে রসজ্ঞান উপলব্ধি করার মত মন তো আর কারুর মধ্যে দেখিনি।' তপন যেন মুহূর্তের জন্য বাচাল হয়ে উঠল।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আগে পাননি বলে কি কোনদিন পাবেন না?'

'জানি না।'

আর একদিন এমনি সুযোগে আবার কিছু কথা হয়েছিল দুজনের। ওরা দুজনে লনে বসে গল্প করছিল আর মিতুল ওর ছোট্ট বাইসাইকেল নিয়ে শুধু ঘুরপাক খাচ্ছিল লনের মধ্যে।

'আপনি কলকাতায় আসেন না?' প্রশ্ন করে সীতা।

'ছুটি পেলেই তো কলকাতা যাই?'

'এর পর কবে আসছেন?'

'নতুন পোস্টিং পাবার পরই ছুটি পাব।'

'আপনি বুঝি আদমপুর থেকে চলে যাচ্ছেন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'দু' এক মাসের মধ্যেই কলকাতা আসছেন তো?'

'তা ঠিক বলতে পারি না।'

ক্ষণিকের জন্য একটু বিরতি। একটু মিতুলকে শাসন, 'আঃ। কি হচ্ছে মিতুল? এত ঘুরপাক খেলে মাথা ঘুরে পড়বে।'

মিতুল সহজ উত্তর দেয়, 'তোমরা গল্প কর না, আমি তো নিজের মনেই সাইকেল চালাচ্ছি।'

'এবার কলকাতা এলে দেখা করবেন তো?' সীতা প্রশ্ন করল।

'করব?'

'করবেন না?'

'আপনি বল্লে করব।'

'না বল্লে করবেন না?'

'সেটা কি উচিত হবে?'

'আপনার ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত জ্ঞানটা তো খুব প্রবল।'

'শুনেছি সব মানুষেরই এই জ্ঞান থাকে।'

আরো কিছু কথা বার্তা।

তারপর সীতা বল্লো, 'তর্ক করা ছাড়ুন তো। কলকাতা গেলে টেলিফোন করবেন।'

'করব?'

'হ্যাঁ করবেন। বিকালের দিকে করবেন।'

'সকালে, দুপুরে, রাত্রে নয়, শুধু বিকেলে?'

'মানে বিকেলের পর যখন ইচ্ছে।'

'তার মানে?'

সীতা একটু ভাবল। তারপর বলেই ফেললো, 'বিকেলের পর ফোন এলে আমিই রিসিভ করি।'

নারী চরিত্র সম্পর্কে তপনের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও ছবিটা অনেক পরিষ্কার হলো এবার। উৎসাহিত না হয়ে পারল না। 'যদি অনেক রাত্রে করি?'

'আপত্তি নেই।'

'ধন্যবাদ। জানা রইল।'

আদমপুরের এসব স্মৃতি কি ভুলতে পারে তপন? পারে না। অসম্ভব। কল্পনাতীত।

আর কী ভুলতে পারে না?

আদমপুর ছাড়ার আগের দিন রাত্রে উইং কমান্ডারের বাড়িতে ডিনার খাবার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব হলো। তারপর উইং কমান্ডার 'বেস্ট অফ্ লাক্' জানিয়ে বিদায় নিলেন। শান্তাবৌদি বিদায় জানাতে বাইরে এসে অনেক কথা বললেন। অনেক কথা বলার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা প্রশ্ন করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক জবাব পাব?'

'নিশ্চয়ই।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'সীতাকে কেমন লেগেছে?'

তপন আনন্দে খুশীতে জবাব দিতে পারেনি। 'গুড নাইট!' ও দৌড়ে অন্ধকার রাস্তায় হারিয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

নতুন পোস্টিং পাবার সময় ছুটি পেল না তপন। ওদের স্কোয়ার্ডনকে

ট্রান্সফার করা হলো জামনগরে। গানার ট্রেনিং। ভ্যাম্পায়ারের চারটি টোয়েণ্টি এম. এম. কামান দিয়ে শত্রুপক্ষের নিশানা ধ্বংসের ট্রেনিং। ট্রেনিং দীর্ঘ নয় তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গানার ট্রেনিং-এর সাফল্যের ওপরেই ফাইটার পাইলটের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই অনেক হিসাব-নিকাশ অনুরোধ-উপরোধ করেও কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না। একটু যেন নিরাশ হলো তপন।

তপনকে বিমর্ষ দেখে ফ্লাইট লেফটন্যাণ্ট চক্রবর্তী হি হি করে হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি এখন ছুটি চেয়েছ? বিয়ের পর পরই ফুলশয্যা না হলে যেমন বিয়ে পূর্ণ হয় না, সেই রকম ভ্যাম্পায়ারের ফ্লাইং-এর সঙ্গে সঙ্গে গানার ট্রেনিং না হলে কিছুই হলো না।'

কি আর হবে? স্কোয়াড্রনের অন্য সবার সঙ্গে চলে গেল জামনগর। ট্রেনিং-এর মেয়াদ মাত্র তিন মাস। ট্রেনিং শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জামনগর বাসের মেয়াদও শেষ হবে। তারপর আবার ওদের স্কোয়াড্রন অন্য কোথাও ট্রান্সফার হবে।

এক বিচিত্র অস্বস্তি নিয়ে জামনগরের দিনগুলো শুরু করল তপন। বার বার মনে পড়ত আদমপুরের দিনগুলোর কথা। সীতার কথা। শান্তাবৌদির কথা……'সীতাকে কেমন লেগেছে?' আচ্ছা, হঠাৎ শান্তাবৌদি ওকথা জানতে চাইলেন কেন? সীতা কি কিছু বলেছে? নাকি উনি নিজেই কিছু বুঝতে পেরেছেন? নাকি যাস্ট সীতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করার মতলবে?

ট্রেনিং-এর পর সময় পেলেই তপনের মতে এই সব চিন্তা ভীড় করে আসে। কিছুতেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। নতুন বন্ধুরা ধরতে না পারলেও বাজপেয়ীর চোখে খটকা লাগে। ও তো অনেক দিন, অনেক দিন ধরে তপনকে দেখছে। খুব কাছ থেকে দেখছে। যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে দেখছে। ঠিক এমন আনমনা কোনদিন দেখেনি। পুরোন বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র বাজপেয়ীই তপনের স্কোয়াড্রনে আছে। বিশ্বাস, ভরদ্বাজ, নায়ার ও অন্যান্যরা অন্যান্য স্কোয়াড্রনে ছড়িয়ে পড়েছে।

'তপন, তোমার কি হয়েছে বলো তো!' বাজপেয়ী শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে পারে না।

'কই, কিছু না তো'।

'বাজে কথা বলো না। আমি কি তোমাকে নতুন দেখছি?'

'কেন? নতুন কি দেখছ?'

'অনেক কিছু।……'

'অনেক কিছু মানে?'

'সব সময় কি ভাবছ? মিসেস সেনগুপ্তার কথা?'

'হ্যাঁ। ওদের কথা খুব মনে হয়।'

'তাই বলে এত ভাবার কি আছে ?'

'না, না, এত ভাবছি কোথায় ?'

বাজপেয়ী এবার একটু কাছে এগিয়ে এসে কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, 'হাকিমপেট ইনফেক্‌শন না তো ?'

চমকে ওঠে তপন. 'তার মানে ?'

'মানে কোন উদ্বত যৌবনার খপ্পরে পড়েছ নাকি ?'

তপন হাসতে হাসতে কথাটা উড়িয়ে দেয়, 'সবাই কি তোমাদের মত, যে মেয়ে দেখলেই মাথা ঘুরে যায় ?'

বাজপেয়ীও হাসে। বলে, 'মাথা ঘোরে সবারই—কারুর আগে, কারুর পরে। আমাদের আগে ঘুরেছে বলে কি তোমার কোনদিনই ঘুরবে না ?'

কেউ আর তর্ক করে না। তবুও তপন মনে মনে ভাবে, ওর কি সত্যই কোন পরিবর্তন হয়েছে ? হয়েছে নিশ্চয়ই। তা না হলে বাজপেয়ী এসব কথা জিজ্ঞাসা করল কেন ? সত্যি কি সে খুব বেশী ভাবছে ? এতই ভাবছে যে বাজপেয়ীর কাছে ধরা পড়ল ?

ভাবে ঠিকই। সময় পেলেই ভাবে। ভাবতে ভাল লাগে। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে লাস্ট সর্টি ফ্লাই করে ল্যান্ড করার আগে দূরের ধূসর কচ্ছ উপসাগর দেখলেই মনে পড়ে যেন সীতার কথা। আচ্ছা, এই ট্রেনিং যদি কচ্ছোপসাগরের পাড়ে না হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে হতো ? তাহলে কি দারুণ মজা হতো। গানার ট্রেনিং জামনগরের বদলে বারাকপুরে হতে পারত না ?

আদমপুর ছাড়ার আগে শান্তাবৌদি মিতুল আর সীতার একটা ফটো দিয়েছিলেন তপনকে। তপনই মিতুলের একটা ছবি চেয়েছিল। শান্তাবৌদি বলেছিলেন, 'শুধু মিতুলের ছবি বোধহয় নেই। এটাই রেখে দাও।'

'আপনার সুন্দরী বোনের ছবি আমার কাছে রাখা কি ঠিক হবে ?'

ঠিক এই সময় উইং কমান্ডার ঘরে ঢুকেই বললেন, 'ইয়ং ম্যান ! কিপ ইট উইথ ইউ। সীতাও তোমার ছবি নিয়ে গেছে।'

কথাটা শুনেই লজ্জায় সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল তপনের।

শান্তাবৌদি স্বামীকে একটু বকুনি দিলেন, 'আঃ ! কি যা তা বলছ।'

'সত্যি কথা বল্লেই যা তা বলা হলো, তাই ?'

তপন চুপ করেই রইল। শান্তাবৌদিই আবার বল্লেন, 'তপনের ছবি পেল কোথায় যে নিয়ে যাবে।'

উইং কমান্ডার তবুও হাসতে হাসতে বল্লেন, 'বিলিভ মী সুন্দরী ! সীতা তপনের ছবি নিয়ে গেছে।'

'আঃ ! কি যা তা বলছ !'

'সুন্দরী বল্লাম বলে রেগে গেলে ?' এইটুকু বলেই তপনের দিকে তাকিয়ে উইং কমান্ডার বল্লেন, 'তোমার বৌদিকে আমি সুন্দরী বলে ডাকি……'

কিছুটা লজ্জায়, শান্তাবৌদি এবার একটু চীৎকার করেই বল্লেন, 'বাজে কথা বল্লেই এবার আমি ঘর থেকে চলে যাব।'

ব্যাপারটা ঐখানে মিটে গেলেও তপনের মনে একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। উইং কমাণ্ডার বা শান্তাবৌদিকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। প্রশ্নটা আজও তার মনের মধ্যেই চাপা পড়ে আছে। এখনও মাঝে মাঝেই সে প্রশ্নটা একটা উত্তর চায়। উইং কমাণ্ডার কি ঠাট্টা করেছিলেন, নাকি সত্যি সত্যিই সীতা ওর ছবি নিয়ে গেছে?

চারপাশের মানুষের থেকে এত দূরে এলেই, একটু নিঃসঙ্গ হলেই তপন মিতুল আর সীতার ছবিটা দেখে। কথা বলে। প্রশ্ন করে। আচ্ছা সীতা, তুমি কি সত্যিই আমার কোন ছবি নিয়েছ? উত্তরের আশায় একটু চুপ করে থাকে। ছবির দিকে চেয়ে থাকে। অপলক চোখে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর আবার জানতে চায়, নিয়েছ? আমাকে কেন বল্লে না? আমি তাহলে খুব সুন্দর ছবি দিতাম। কোথায় রেখেছ ছবিটা। আর কেউ দেখেনি তো?

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে সীতাকে দেখা।

আচ্ছা শান্তাবৌদির কাছে আমার একটা ফটো চাইতে তোমার লজ্জা করল না? উনি কিছু বললেন না? নাকি উনি নিজে থেকেই ফটোটা তোমাকে দিলেন?

সীতার ফটোটাকে একটু আদর করে তপন। নিবিড়ভাবে আদর করে। ছোট্ট অবুঝ শিশুর মত ও আপন মনে কতক্ষণ কত কথা বলে। আনন্দে খুশীতে ঝলমল করে ওঠে।

শীতের সিমলার মত হঠাৎ কালো মেঘে ঢাকা পড়ে তপনের মনের আনন্দ-সূর্য। হঠাৎ মনে পড়ে দূরের কলকাতার কথা। কতদূর। বাপরে বাপ। ভাবতেও অবাক লাগে। কলকাতার ঠিক উল্টোদিকে, ভারতবর্ষের অন্তিম পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে ও। পূর্বদিকে কলকাতা যতদূর, পশ্চিমদিকে ইরানের আবাদন, ইরাকের বসরা প্রায় ততদূর। মনটা বিষন্ন হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে এয়ার ফোর্সের ওপর রাগ হয় তপনের। অন্য কোন চাকরিতে এত কড়াকড়ি নেই। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ছুটি পাওয়া যায় কিন্তু এখানে সে স্বাধীনতা অসম্ভব। তাছাড়া এ চাকরিতে এসে সমাজ সংসারের সব আপনজনকে দূরে রাখতে হয়েছে। এই দুনিয়ায় সবাই চাকরি করে, পরিশ্রম করে কিন্তু দিনের শেষে তারা সবাই কাছে পায় আপন আপন প্রিয়জনকে। হাসে, খেলে, গল্প করে। সুখ দুঃখ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। আর তপন? সে নিঃসঙ্গ। সে একা। দূরের আরব সাগরের হাওয়ায় সে যেন মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণহীন মরুভূমির স্পর্শ অনুভব করে।

দিল্লীর পালাম, মাদ্রাজের তাম্বারাম, আগ্রা বা অন্যান্য বড় বড় শহরের পাশেই যেসব এয়ার ফোর্স স্টেশন গড়ে উঠেছে, সেখানে চাঞ্চল্য অনেক। জাম-

নগরে সে জীবন সম্ভব নয়। তবু এখানে যারা থাকে তারাও আনন্দ করে। হাসে। কত কি করে। আশে পাশে কত ভাল ভাল জায়গা আছে। কতজনে সে সব দেখতে যায়। এইত ক'দিন আগেই তপনদের স্কোয়াড্রনের সবাই দ্বারকা ঘুরে এলো। ভোরবেলায় রওনা হয়ে রাত্রিতেই ফিরে এলো। বেশ কাটল দিনটা। তপনেরও। দ্বারকাধীশের মন্দির ছাড়াও রুক্মিনী মন্দির আর ভরকেশ্বর দেখল। আর দেখল জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের ঐতিহাসিক মঠ। ভারী চমৎকার। তাছাড়া সরকারী বিশ্রান্তি গৃহে হৈ-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া।

কিন্তু এমন দিন তো রোজ কাটে না। কাজকর্মের পর অনেকেই অবশ্য শহরে চলে যায়। তপনও গেছে। যায়। মাঝে মাঝেই যায়। দেখেছে লোকের মাঝখানে লাখোতো ফোর্ট, খাম্বালিয়া গেট, কোঠা বস্তিয়ান, সিটি লেক আর শ্যামসন। ঘুরে বেড়িয়েছে কমলা নেহেরু পার্কে, টেগোর পার্কে, আজাদ পার্কে আর মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনে। সিনেমা দেখেছে অনুপমা আর জয়শ্রীতে। হাভেমোর ও ক্রীম সেণ্টারে লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছে কয়েকদিন।

আরো কত কি করে। আড্ডা দেয়, বিলিয়ার্ড খেলে, হুইস্কী খায়। তবু মন ভরে না। মাঝে মাঝেই শূন্যতার জ্বালা অনুভব করে তপন। না করে পারে না। বার বার মনে পড়ে সীতার কথা। ওর সুন্দর মুখের চেহারাটা। কি মিষ্টি, কি শান্ত ওর মুখখানা! একবার দেখলেই যেন মন ভরে যায়। জীবনের সব অপূর্ণতাই ও পূরণ করতে পারে।

অপূর্ণতা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ অপূর্ণতা। সীতাকে দেখার আগে কোন অপূর্ণতাই ছিল না ওর। ওদের সংসারে। বাবা-মা আর দু ভাই। বাবা আগের কালের এম, বি ডাক্তার হলেও পসার বেশ। রোজ সকাল-সন্ধেয় গড়িয়াহাটের মোড়ে ওর বাবার চেম্বারে বেশ ভীড় জমে যায়। যোধপুর পার্কে নিজেদের একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়ি থাকলেও ওরা হিন্দুস্তান পার্কের ভাড়া বাড়িতেই থাকে। বহুকাল ধরে আছে। তপনের জন্মের আগে থেকে। এখান থেকে ডিসপেন্সারীটা কাছেই। তাছাড়া ওর বাবার অধিকাংশ পেশেণ্টই এই এরিয়ার। তপনের দাদাও ডাক্তার। এম, বি, বি, এস। তবে প্র্যাইভেট প্রাকটিশ করে না। দুর্গাপুর স্টীল প্লাণ্টের হাসপাতালে চাকরি করে। বিয়েও হয়ে গেছে। বেশ ভালই আছে। সুখে আছে। তপন গতবার ছুটিতে দুর্গাপুরেও গিয়েছিল। বৌদির কাছে ক'দিন বেশ ভালই ছিল। সারাদিনই বাড়িতে বসে গল্প করতে বৌদির সঙ্গে। কত কথা হয় দুজনের মধ্যে।

'আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কমার্শিয়াল পাইলট হলে না কেন?'

হাসতে হাসতে তপন জবাব দেয়, ডাকোটা আর ভাইকাউণ্ট চালিয়ে হাজার হাজার টাকা মাইনে পেয়ে এয়ার হোস্টেসদের নিয়ে ছিনিমিনি খেললে বুঝি তোমার খুব ভাল লাগে?'

'সব পাইলটই কি এয়ার হোস্টেসদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ?'

'সবাই কোন কাজই করে না।'

'তবে ?'

'কমার্শিয়াল পাইলটদের জীবন বড় একঘেয়ে।'

বৌদি চমকে ওঠেন, সে কি ? দিল্লী-বোম্বে-মাদ্রাজ ঘুরে বেড়ায় ; আবার বলছ একঘেয়ে ?

তপন হাসতে হাসতে বলে, রোজ রোজ ঐ কলকাতা-আগরতলা বা কলকাতা-বেনারস-দিল্লী করতে একঘেয়ে লাগবে না ?

এসব নিয়ে ওদের বাড়িতে এর আগে অনেক আলোচনা হয়েছে। তপন একটু বড় হবার পর থেকেই এয়ার ফোর্সে জয়েন করতে চেয়েছে। প্রথম দিকে বাড়ীর কারুরই বিশেষ মত ছিলো না। তারপর অনেক দিন অনেক আলোচনার পর মা বলেছিলেন, ঠিক আছে। তাহলে ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বার হয়ে যা।

তপন বলেছিল ঐসব শৌখীন পাইলট হবার কোন শখ নেই। পাইলট হবো অথচ কোন থ্রীল থাকবে না, তার কোন মানেই হয় না।

'কিন্তু এয়ার ফোর্সে যখন তখন বিপদের সম্ভাবনা।'

'কিসে বিপদের সম্ভাবনা নেই মা ?'

কমার্শিয়াল পাইলট হয়ে এয়ার হোস্টেসদের সঙ্গে ন্যাকামী করার শখ কোনদিনই ওর ছিল না। শুধু তাই নয়, ও সব সময় মেয়েদের থেকে দূরে থেকেছে। দুর্গাপুরে ওর দাদার বাংলোর সামনেই ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজারের বাংলো। দুই পরিবারের মধ্যে খুব ভাব কিন্তু তবুও যেতে চাইত না।

চল না ঠাকুরপো একটু ও বাড়ি ঘুরে আসি।'

'না বৌদি আমি যাব না।'

'কেন ?

'ঐ বলাকার সামনে আমি কেমন আনইজি ফিল করি।'

বৌদি হাসেন, 'কেন ? বলাকা তো ভারী সুন্দর মেয়ে।'

'তবুও আমার যেন কেমন লাগে।'

সেই তপন জামনগরে অফিসার্স মেসে শুয়ে শুয়ে শুধু সীতার কথা ভাবে। সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন ওর মুখের ছবি দেখতে পায় তপন। আশ্চর্য হলেও এমন হয়। দিনের আলোয় হাস্নাহানার কোন গন্ধ নেই, কোন আকর্ষণ নেই কিন্তু রাতের অন্ধকারে ? হাস্নাহানার গন্ধে মানুষ মাতাল হয়।

জামনগরের মেয়াদ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে। ইচ্ছা করছিল একটা টেলিফোন করে সীতাকে খবর দিতে। অথবা একটা চিঠি। পারেনি। লজ্জায়, দ্বিধায় পারে নি। শান্তাবৌদিকেই জানাল, এবার সত্যি সত্যিই ছুটি পাচ্ছি। কলকাতা যাচ্ছি। মা বড় বেশী অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাই ছুটি হবার সঙ্গে

সঙ্গেই রওনা হবো। এরপর আমাদের স্কোয়াড্রন কোথায় মুভ করবে জানি না ; তবে যদি ভাগ্যক্রমে আবার আপনাদের কাছে পাই তাহলে · ’

ক'দিনের মধ্যেই শান্তাবৌদির চিঠি এলো. কলকাতা যাচ্ছ শুনে দারুণ খুশী হলাম। তুমি কলকাতা যাচ্ছ শুনে আমারও ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়। যাই হোক আমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই যাবে। বাবা-মাও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। ওঁরা সব চিঠিতেই তোমার কথা লেখেন। তাছাড়া সীতু আর মিতুল তো আছেই।

এরপর আদমপুরের নানা খবর দিয়েছেন। কে কে বদলী হয়েছেন, কারা নতুন এসেছেন। তাছাড়া স্কোয়াড্রন লীডার কটরুর বিয়ের খবর. আর লিখেছেন নিজের নিঃসঙ্গতার খবর। তুমি প্রায় তিন মাস চলে গেছ। তবু সব কাজে তোমার কথা মনে হয়। প্রাণ খুলে কথা বলার মত কেউ নেই। স্কোয়াড্রন লীডার বোস মাঝে মাঝে আসেন. গল্প করেন। কিন্তু তোমার সঙ্গে যেভাবে মিশেছি সেভাবে ওর সঙ্গে মেশা সম্ভব নয়।

সব চাইতে চাঞ্চল্যকর খবর দিয়েছেন চিঠির শেষে। 'এবার তুমি কলকাতা যাচ্ছ। সুতরাং খবরটা আর চেপে রাখা ঠিক হবে না। এতদিন তোমাকে বলিনি বলে মনে কিছু করো না। হাজার হোক আমি তোমার বৌদি তো। একটু আধটু সত্যি-মিথ্যে কথা বলে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করার অধিকার আমার আছে। তাই না ? সীতু সত্যি তোমার একটা ছবি নিয়ে গেছে

এঁ্যা !

চিঠি পড়তে পড়তেই তপন প্রায় চিৎকার করে উঠল।

···বার বার ও আমাকে বলেছিল. তুমি কাউকে বলবে না কিন্তু ! একদিন রাত্রে গল্প করতে করতে তোমার দাদাকে না বলে পারিনি। আজ তোমাকেও না জানিয়ে পারলাম না। দেখ ভাই. সীতু যেন একথা না জানে ! একথা ও জানলে আর কোনদিন আমাকে বিশ্বাস করবে না।'

ওদের স্কোয়াড্রন এবার পুণায় মুভ করছে। তবে 'গানার ট্রেনিং' এর পর অনেকেই ছুটি পেয়েছে। বাড়ি যাবে। বেড়াতে বেড়াতে বাড়ি যাবে। তপন একটা দিন. একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে রাজী নয় বলে ছুটি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই জামনগর ত্যাগ করল। পকেটে ফার্স্ট ক্লাশ পাশ নিয়েই সকালবেলায় জনতা এক্সপ্রেস ধরল। দুপুরে দ্বারকা মেল ছিল কিন্তু তাহলে রাজকোট গিয়ে ট্রেন বদলী করতে হতো। জনতা চারটে নাগাদ ভিরামগাম পেঁছায় আর দ্বারকা মেলের কানেকটিং ট্রেন আসে রাত সাড়ে আটটার পর। অত দেরী হলে একটা রাত আমেদাবাদে কাটাতে হয়। একটা রাত কি নষ্ট করতে পারে তপন ? রাত্রে আমেদাবাদ পেঁছেই আবার বোম্বের ট্রেন ধরল।

পরের দিন সকালে বোম্বে। সন্ধ্যেবেলায় আবার ক্যালকাটা মেল। আর-টি-ও অফিসে রিজার্ভেশন চেক করে একবার শহরটা দেখতে বেরিয়েছিল। বেশী

দূর যায়নি। ফ্লোরা ফাউণ্টেন—চার্চ গেট—মেরিন ড্রাইভ ঘুরেই দুপুরটা কাটিয়েছিল। আগে আগে বোম্বে দেখার খুব শখ ছিল। কিন্তু সেদিন বেশী ঘুরতে একটুও ইচ্ছা করল না। তপন মনে মনে বল্লো, এত ব্যস্ত হবার কি হয়েছে? এয়ার ফোর্সে যখন ঢুকেছি তখন শুধু বোম্বে কেন, সারা দেশটাই তো দেখতে পাব। যাই হোক ক্যালকাটা মেল প্ল্যাটফর্মে দেবার পর তপনই বোধহয় প্রথম ট্রেনে উঠল! উঠবে না? এ ট্রেন যে ওকে কলকাতা নিয়ে যাবে?

বোম্বে থেকে কলকাতা যাবার জন্য এই ক্যালকাটা মেলই সব চাইতে ভাল ট্রেন। তাছাড়া এটা ভায়া নাগপুর। এলাহাবাদ হয়ে গেলে আরো দেড়শ' মাইল চক্কর কাটাতে হয়। চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় বেশী লাগে। ক্যালকাটা মেল প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার পথ ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ ঘণ্টায় পাড়ি দেয়। সহজ কথা নয়। ভালই বলতে হবে কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যখন দেখল আকোলা এসেছে, তখন ক্যালকাটা মেল সম্পর্কে তপনের ধারণা মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেল। হাওড়া পৌঁছতে আরো চব্বিশ ঘণ্টা! হা ভগবান! এই মেল ট্রেন! ইউরোপ আমেরিকার কথা না হয় ছেড়েই দিল. কিন্তু জাপান? এসব মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মন আরো খারাপ হয়! এখন ওয়ার্ধা, নাগপুর. বিলাসপুর, রুরকেল্লা, চক্রধরপুর. টাটানগর, খড়্গপুর পেরুতে হবে।

মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

আচ্ছা সীতা যদি ওর স্ত্রী হতো আর সে অসুস্থা থাকতো? তাহলেও এই ট্রেনে চড়েই ওকে যেতে হতো? এর চাইতে আর তো কোন ভাল ট্রেন নেই? জানালার ধারে বসে বসে ধূসর মাঠ দেখতে দেখতে তপন ভাবে। এই ট্রেনেই তো বহুজন যাচ্ছে যাদের স্ত্রী-পুত্র অসুস্থ, যাদের বাবা-মা হয়ত মৃত্যু-শয্যায়। এমন স্পীডে ট্রেন চললে হয়ত তারা আর ওদের প্রিয়জনকে দেখতেই পারবে না।

সর্বনাশ! চমকে ওঠে তপন। ওর যদি এমন কোনদিন আসে? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়াতে নাড়াতে মনে মনে বলে না. না তা হতে পারে না।

কম্পার্টমেণ্টের চারজন যাত্রীর মধ্যে আপার বার্থের দুজনেই শুয়ে আছেন। একজন তো একটু আগেও ঘুমুচ্ছিলেন। আরেকজন সকালবেলার বাথরুম ঘুরে এসে আবার শুয়ে পড়েছেন। মানে শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছেন। লোয়ার বার্থের ওপাশের যাত্রীটি টাটানগর যাবেন। রাত্রে প্রচুর ড্রিংক করে এখনও মহানন্দে স্বপ্ন দেখছেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাল রাত্রে ওর একটু আলাপ হয়েছিল। উনিই আলাপ করেছিলেন। একটা গেলাসে খানিকটা হুইস্কী ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'হ্যাভ্ ইট!'

তপন ধন্যবাদ জানিয়েছিল, থ্যাংকস্: 'ইউ ক্যারী অন।'

'কেন? আপনি ড্রিংক করেন না?'

'করি তবে এখন প্রয়োজন নেই।'

ভদ্রলোক হো হো করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, বলতে পার এর প্রয়োজন কখন হয় না? প্রেমে পড়লে ড্রিংক করতে ভাল লাগে; প্রেম ব্যর্থ হলে ড্রিংক করতে আরো ভাল লাগে। অর্থ প্রতিপত্তি হলে ড্রিংক করে, সেই অর্থ প্রতিপত্তি হারাবার পর ড্রিংক না করলে বাঁচা যায় না ..

তপন হাসছিল।

'হাসছেন কেন? হ্যাভ ইট!' বলেই ভদ্রলোক গেলাসটা এগিয়ে ধরলেন। ও এবার আর প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করল।

ড্রিংক করতে করতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে টুকটাক কথা হয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর আর কারুর সঙ্গেই কোন কথা বলেনি তপন। ডাইনিং কারের বেয়ারা এলে অবশ্য দুটো একটা কথা বলেছে। তাছাড়া আপন মনে এইসব নানা কথা ভাবছে। আচ্ছা, যারা রেলে চাকরি করে তারা রেলের পাশ পায়, যারা প্লেনের কোম্পানীতে চাকরি করে তারা প্লেনের পাশ পায় কিন্তু এয়ার ফোর্সের পাইলট হয়েও ·

এগুতে গিয়েও বাধা পেল। ভাবল, তাই কি সম্ভব? এয়ার ফোর্সের সবাইকে প্লেনে যাতায়াতের সুবিধা দিতে হলে তো আর একটা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স খুলতে হবে। কিন্তু…

তপন আরো ভাবে। খুব নিবিষ্ট মনে ভাবে। অনেক যুক্তি অনেক তর্ক মনে আসে। দূর ছাই! ওসব আলতু-ফালতু ভেবে লাভ নেই' হঠাৎ খেয়াল হলো ট্রেনের স্পীড কমে এসেছে। কম্পার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রথমে করিডরে দাঁড়াল। তারপর একবার দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল। সিগন্যাল আর অনেকগুলো লাইন দেখে মনে হলো একটা বড় স্টেশন আসছে। হ্যাঁ ঠিকই। এলো ওয়ার্ধা।

ফ্লাইং অফিসার তপন সরকারের মন উড়ে চল্লেও ক্যালকাটা মেল নির্ধারিত গতিতে ঠিকই এগিয়ে চলে। পার হয় রায়পুর, বিলাসপুর। এরপর ডিনার। কিছুক্ষণ জেগে থেকে শুয়ে পড়ে। সারাদিন একটুও ঘুমোয়নি কলকাতার চিন্তায়, সীতার কথা ভাবতে ভাবতে কিছুতেই ঘুমুতে পারেনি। ঘুম আসেনি। এবার ঘুম এসেছে। ঘুমুতে ইচ্ছে করছে। আনন্দ হচ্ছে। তপন ভীষণ খুশী। ঘুম ভাঙলেই কলকাতা! হাওড়া! খড়্গপুর যখন পার হবে তখনও রাত থাকবে। মানে অন্ধকার থাকবে। সূর্য ওঠার দেরী থাকবে। সূর্যের আলোয় যখন ওর ঘুম ভাঙবে তখন হয়ত বাগনান বা উলুবেড়িয়া পার হয়ে যাবে। তা না হলে সাঁতরাগাছিতে গিয়েও ঘুম ভাঙতে পারে।

সত্যি সত্যিই যখন ঘুম ভাঙল তখন ক্যালকাটা মেল সাঁতরাগাছি স্টেশনে

ঢুকছে। ভ্যাম্পায়ার থেকে যেমন করে বেল আউট করতে হয়, তপন অনেকটা সেই রকম ভাবেই বার্থ থেকে লাফ মেরে উঠল। কোনমতে জামা-কাপড় পাল্টে হোল্ডলটা বাঁধতে বাঁধতেই ক্যালকাটা মেল হাওড়া স্টেশনে ঢুকে পড়ল।

এই সেই হাওড়া! সেই কলকাতা! অন্যমনস্ক হয়েও তপন যেন খুব জোরে জোরে, বুক ভরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল। একবার প্রাণ ভরে হাওড়া ব্রীজটা দেখল। কত স্বপ্ন, কত আশা, কত প্রত্যাশার প্রতীক এই হাওড়া ব্রীজ। কলকাতায় থাকতে কোনদিন এই হাওড়া ব্রীজের আকর্ষণ অনুভব করেনি। কলকাতার কেউই করেন না। কলকাতা ছাড়ার পর? দূরে, বহু দূরে হাজার দেড় হাজার বা দু হাজার মাইল দূরে থাকলে? এই হাওড়া ব্রীজের স্বপ্ন দেখে সব বাঙালী। বহুদিন পর, বহু দূরে থেকে কলকাতা আসার সময় এই হাওড়া ব্রীজই হচ্ছে আনন্দের বিজয় নিশান।

ট্রেন থেকে নামতেই মা দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। পায় হাত দিয়ে প্রণাম করার পর্যন্ত সুযোগ দিলেন না তপনকে। দু'এক মিনিট বুকের মধ্যেই চেপে রাখলেন। তারপর তপন বাবা-মাকে প্রণাম করতে করতে বল্লো, আচ্ছা মা, এত বড় ছেলেকে কেউ এমন ভাবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে?

মাথার ঘোমটা ঠিক করতে করতে মা বল্লেন, 'আমি জড়িয়ে ধরলাম, নাকি তুই জড়িয়ে ধরলি?'

ডাঃ সরকার পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তির হাসি হাসছেন।

তপন ও কথার জবাব না দিয়ে বল্লো, এখন আর আমাকে অমন করে আদর করো না, লোকে হাসাহাসি করবে।

গমন করেই হাওড়া স্টেশনের অভ্যর্থনার পর্ব শেষ হলো। প্রত্যেকবারই এমন হয়। আসার সময় হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরা আর ফিরে যাবার সময় জড়িয়ে ধরে কান্না! আবার সেই মরিস-এইট চাপা। ডাঃ সরকার নিজেই ড্রাইভ করেন। আজও ডাঃ সরকার গাড়ী চালাচ্ছেন। পিছনে মা আর ছেলে। অন্য সময় হলে মা সামনে বসতেন। বাবার পাশে। এখন আর স্বামীর পাশে নয়, ছেলের কাছে বসেছেন।

ডাঃ সরকার গাড়ি চালাচ্ছেন আর ওরা দুজনে নানা কথা বলছেন। মা প্রশ্ন করছেন, ছেলে জবাব দিচ্ছে; ছেলে প্রশ্ন করছে, মা জবাব দিচ্ছেন। বাড়ির কথা, দাদা-বৌদির কথা। ছোট মামীর কথা। আরো কত কি। হঠাৎ মা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁরে, শান্তার মেয়ে আর বোন ফোন করেছিল······'

'কবে?' উত্তেজনায় একটু জোরেই বললো।

'ওরা তো মাঝে মাঝেই টেলিফোন করে।'

'তাই নাকি?' এবার বেশ সংযত হয়েই জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। কাল রাত্রেও করেছিল ···'

'আচ্ছা ?'

'তুই আসছিস সে খবর ওরা শান্তার চিঠিতে জেনেই আমাকে ফোন করেছিল।'

তপন মুখে কিছু বললো না। মনে মনে দারুণ খুশী হলো। এসপ্লানেডের মোড় পার হলো। বাস স্টপে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু মেয়েও। ঐ কোণার দিকের মেয়েটাকে সীতার মত দেখতে না ? ও মুহূর্তের জন্য ভাবল। অনেক দিন পর কলকাতা এলে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের দেখে দারুণ পরিচিত মনে হয়। তাই ঐ মেয়েটাকে সীতার মত মনে হয়েছিল। সব বাঙালী মেয়েদের মধ্যেই কিছুটা মিল আছে। তাইতো ···

'জানিস বাবুল, আদমপুর থেকে ঘুরে আসার পর সীতা আর মিতুল একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল '

'কই আমাকে তো কিছু জানাওনি ?' তপন একটু অবাক হয়েই বল্লো।

'জানাইনি ?'

'না তো।'

'তাহলে চিঠি লেখার সময় খেয়াল হয়নি। একটু চুপ করে মা প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা তুই চিঠিপত্র লিখিস না কেন বলত ?'

তপন হাসতে হাসতে বলে, 'আর কত চিঠি লিখব ?'

'বাজে বকিস না। আদমপুরে থাকতে তবু শান্তার চিঠিতে তোর খোঁজ খবর পেতাম কিন্তু এখন তো···'

'শান্তাবৌদি বুঝি তোমাকে চিঠি দিত ?'

'এখনও দেয়।'

'আচ্ছা !'

'শান্তা মেয়েটা খুব ভাল, তাই না রে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোকে ওরা খুব ভালবাসে।'

'তা তো বাসেই।'

'সীতা মেয়েটিও ভারী চমৎকার।'

'তুমি তো সবাইকেই চমৎকার বল।'

'তুইও দেখছি তোর বাবার মত কথা বলতে শুরু করেছিস।'

তপন হাসে। হাজরার মোড় পার হতে দেখল।

মা আবার বল্লেন, 'সত্যি সীতাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। আর মিতুলটাকে দেখলেই তো আদর করতে ইচ্ছে করে।'

সীতার বিষয়ে কিছু না বলে ও শুধু জানতে চাইল, 'আমার কথা মিতুল বললো ?'

'হ্যাঁ। অনেক কথা বল্লো। তুই বাড়ীতে পেঁছে ওদের একটা ফোন করিস।'

'আচ্ছা দেখা যাবে।'

'তাছাড়া একবার দুর্গাপুরে ফোন করবি। বৌমা বার বার করে বলেছেন।'

'আর কেউ···

'না। আর আবার কে বলবে?'

॥ ছয় ॥

ডাঃ সরকার ওদের বাড়ীতে পেঁছে দিয়েই ডিসপেন্সারী চলে গেলেন। তপনকে একটু চা-টা দিয়ে মাও গেলেন স্নান করতে। তারপর স্তোত্র পাঠ। বৃন্দাবন রান্নাঘরে রান্না করছে। একটু ফাঁকা না হলে কি সীতাকে টেলিফোন করতে পারে?

তপন আর দেরী করল না। 'হ্যালো। আদমপুর থেকে শান্তাবৌদি এসেছেন?'

'আর চালাকি করতে হবে না। কখন এলেন?' সীতার গলা।

'বলুন তো আমি কে?'

'বলব?' সীতা যেন হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করল।

'বলুন।'

'বাবুল!' আর হাসি চাপতে পারল না সীতা।

'মাই গড!' চমকে ওঠে তপন, আপনি বাবুলকেও চেনেন?

দুদিক থেকেই একটু হাসি। তৃপ্তির হাসি। খুশীর হাসি।

এবার সীতা আবার প্রশ্ন করে, তারপর বলুন কেমন আছেন?

'খুব ভাল কি থাকা উচিত?'

সীতা জবাব দিতে পারে না।

"কি? জবাব দিচ্ছেন না যে?' তপন উত্তরের জন্য দাবী জানায়।

'ভাল না থাকার কোন কারণ ঘটেছে নাকি?'

'আপনি জানেন না? এমন করে ও কোনদিন কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলেনি কিন্তু আজ যেন সে এক নতুন মানুষ। কথা না বলে পারছে না। কথা বলবে বলেই তো কলকাতা এসেছে।

'ওসব কথা ছাড়ুন। বলুন কখন দেখা হচ্ছে'? সীতা ওর প্রশ্ন এড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল।

'আপনি, কলেজ যাবেন না?'

'ছুটি।'

'আজ দেখা হবে?'

'আপনার সময় হলেই হবে।'

'আমার সময়?' তপন হাসে, 'কলকাতায় এলামই তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কেন মিথ্যে কথা বলছেন? এসেছেন তো মা-বাবার আদর খেতে।'

'শুধু মা-বাবার আদর?'

'আর দাদা-বৌদির।'

'আর?'

'আর জানি না।'

'জানেন না?'

'না।'

সীতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল তপন। প্রায় মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, আপনি আদর করবেন না। কোনমতে নিজেকে সংযত করল। 'না জানলেও এবার জানতে পারবেন কার আদর খেতে কলকাতা এসেছি…'

অনেকক্ষণ টেলিফোনে কথা বলছে। সীতা এবার কাজের কথায় আসে, অনেকদিন তো বাংলা সিনেমা দেখেন না, দেখবেন?

'দেখব।'

'তিনটার মধ্যে বিজলীর সামনে আসবেন। আমি টিকিট কেটে অপেক্ষা করব।

তপনের জীবনে এবার সত্যি সত্যিই বসন্ত এলো। খুলে গেল তার জীবনের দক্ষিণ দ্বার। প্রায় সবার জীবনেই কোন না কোন সময়ে বসন্ত আসে। চোখে নেশা লাগে। বাতাসে গন্ধ লাগে। তিথি-নক্ষত্র বিচার করে পূজা-পার্বণের লগ্ন নির্ধারিত হয় কিন্তু মানুষের জীবনের পরম লগ্ন আসার কোন নিয়ম নেই। সময় নেই অসময় নেই। কেউ সূর্যমুখী, কেউ হাস্নাহানা। কেউ আত্মপ্রকাশ করে ভোরের সূর্যের প্রথম আলোয়, কেউ করে রাতের অন্ধকারে সবার দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু যখন মানুষের জীবনে সেই মহালগ্ন আসে তখন সে নতুন জীবনের স্বাদ পায়, তার নবজন্ম হয়। জীবনের সব অতীত মূল্যবোধ পাল্টে যায়। সমস্ত অতীত আর বর্তমান একসঙ্গে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আসন্ন ও সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

একে ম্যাটিনী শো তারপর উপরতলার ব্যালকনির টিকিট। একেবারেই ভীড় নেই। দুজনেই ভারী খুশী। জীবনে এমন সুযোগ তো এর আগে আসেনি। ওদের জীবন-বসন্তোৎসবের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান বেশ ভালভাবেই সুসম্পন্ন হলো। ঘণ্টা বাজল। গেটের পর্দা টেনে দিল গেটকিপার। আবার ঘণ্টা বাজল। হলের আলো স্তিমিত হলো। আবার ঘণ্টা। সারা হলের আলো নিভে গেল। হলের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের পর্দায়

প্রায় সূর্যরশ্মির মত আলো ঠিকরে পড়ল। আলো পড়ল ওদের দুজনের মনের পর্দাতেও।

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।' সীতার কানের কাছে মুখ নিয়ে তপন বল্লো।

মুখে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে সীতা ছোট্ট জবাব দেয়, কেন?

'সিনেমা দেখালেন আর…'

'আর কি?'

'বলব?'

'বলুন।'

'মনে কিছু করবেন না?'

'কিছু মনে করব না।'

'তিন ঘণ্টা আপনার সাহচর্য পাবার জন্য ধন্যবাদ।'

সীতা একবার দেখল ওকে। 'আপনি ভীষণ বিনয়ী। এ রিয়েলি গুড বয়।'

'আপনি বুঝি খুব খারাপ?'

'খারাপ না হলেও আপনার মত বিনয়ী নই।'

'তাহলে কি? উদ্ধত?'

'আপনার চাইতে, অনেক ফ্রি এ্যাণ্ড ফ্রাঙ্ক।'

'জানা রইল।'

দুজনের দৃষ্টিই সামনের পর্দায় বাধা পাচ্ছে না। ভবিষ্যতের দিগন্ত বিস্তৃত পর্দায় নিজেদের ছবি দেখছে। ভাবছে। মাঝে মাঝে এ ওকে দেখছে। চোখে একটু নেশা, একটু ইসারা, একটু বিদ্যুতের স্পর্শ। কখনও ঠোঁট কামড়াচ্ছে অথবা জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে।

'ভাবতে পারিনি আজই আপনার সঙ্গে এমন করে দেখা হবে' তপন আর চুপ করে থাকতে পারে না।

'কেন?'

'ভেবেছিলাম আপনার কথা মত বিকেলের দিকে ফোন করব। একটু কথা বলব।'

'দেখা হবার জন্য বিরক্ত লাগছে নাকি?'

'রেঞ্জার্স না, একেবারে ডার্বির ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি…

'বাজে বকবেন না।'

'আপনাকে ছুঁয়ে বলছি' বলেই তপন হঠাৎ ওর হাতে হাত রাখল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত না হয়ে পারল না, 'সরি।'

সীতা এবার একটু ভাল করে ওকে না দেখে পারল না।

'আপনি ভারী ইণ্টারেস্টিং!'

'কেন? কি করলাম?'

'খারাপ বলিনি, ভয় নেই।'

'নেই তো?'

'না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আবার চুপচাপ। কারুরই মুখে কথা নেই। তাতে কি হলো? মনের মধ্যে অজস্র কথার ভীড় জমে আছে ওদের। প্রকাশ হচ্ছে না। প্রকাশ করতে পারছে না। চাইছে না। লজ্জায়, দ্বিধায়। সামাজিক রীতিনীতির জন্য। টেপ রেকর্ডারের টেপ বা গ্রামোফোন রেকর্ডে কত কথা বন্দী থাকে কিন্তু·

'ক' দিনের ছুটি?' সীতাও একটু নিশ্চিন্ত হতে চায়।

'কতদিন হলে আপনি খুশী হবেন?'

'আমার খুশীর জন্য কি আপনি ছুটি নিয়েছেন?'

'সব কথা বলতে পারলে অনেকটা স্বস্তি পেতাম কিন্তু পারছি না···'

'বলতে কি আমি বারণ করেছি?'

'এখন নয়, পরে বলব।'

'আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না?'

'ছুটি কতদিনের?'

'যতদিন সিনেমা দেখাবেন আর থাকতে বলবেন।'

সীতা আবার হাসে. 'ফাইটার পাইলট হয়েও আপনি তো বেশ রোমান্টিক।'

'আমি রোমান্টিক নই. আমাকে রোমান্টিক করা হয়েছে।'

আবার একটু নীরবতা। আবার একটু চুরি করে পাশ ফিরে দেখা। কিন্তু কতক্ষণ? জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত লাভা কতক্ষণ আত্মগোপন করে থাকতে পারে? তপন আর চুপ করে থাকতে পারল না। 'সিনেমায় এসেছেন সেকথা বাড়ীর সবাই জানেন?'

পাল্টা প্রশ্ন করল সীতা. 'আমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে আসছেন সেকথা আপনার মা জানেন?'

'না।'

'তবে কি বলে এলেন?'

'বল্লাম একটু ঘুরতে যাচ্ছি।'

'কোথায়, কার সঙ্গে, সেসব কিছু বল্লেন না?'

'না।'

'মা জিজ্ঞাসা করলেন না?'

'জিজ্ঞাসা করলেন কখন ফিরব।'

'কি বল্লেন?'

'বল্লাম যদি কপাল ভাল হয় তাহলে দেরী করে ফিরব।'

'ওকথা বল্লেন কেন ?'

'যদি বাই চান্স আপনার আসা সম্ভব না হতো, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে যেতে হতো। তাছাড়া··'

তাছাড়া আবার কি? বেশ কৌতূহলী হয়ে সীতা জানতে চায়।

'অদৃষ্ট ভাল হলে সিনেমা দেখার পরেও আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে পারি।'

মাথাটা ঘুরিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে চাপা হাসি হাসতে হাসতে সীতা বল্লো, 'তাই নাকি ?'

'নিশ্চয়ই।'

ছবি শেষ হবার পর রাস্তায় এসে সীতা জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবেন ?'

'এখানে কোন দোকানে আপনাকে নিয়ে চা খেতে যাব না।'

অবাক হয় সীতা, 'কেন ?'

'আপনাকে নিয়ে কোন চায়ের দোকানে ঢুকলেই লোকগুলো এমন বিশ্রীভাবে আপনাকে দেখবে যে মনে হবে ওরা কোনদিন মেয়ে দেখেনি।'

কথাটা ঠিক। সীতা হাসল। 'তাহলে কোথায় চা খাবেন ?'

'এসপ্লানেডের দিকে যাবেন ?'

'বেশী দেরী হবে না ?'

'ক'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে চান ?'

'সাতটা-সাড়ে সাতটা।'

'গুড লাক। প্লেন্টি অত টাইম।'

বসন্তের প্রথম সন্ধ্যায় আনন্দে, তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল তপনের মন। মানুষের জীবনে অসংখ্য প্রত্যাশা। পূর্ণ হয় না সে প্রত্যাশা। অধিকাংশ জীবনেই এই ব্যর্থতা, এই হতাশা। অত আশা করলে দুঃখ অনিবার্য। ও সেকথা জানে। তাইতো ও কোনদিনই অনেক কিছু আশা করেনি। অসংখ্য প্রত্যাশা আর হতাশায়, নিজের জীবনকে ভরিয়ে তুলতে চায়নি। বরাবর। চিরকাল। ঐ ওর স্বভাব। বেশী কিছু চায় না; তবে যা চায়, প্রত্যাশা করে, তা প্রাণমন দিয়ে কামনা করে। আর প্রাণমন 'দিয়ে চেয়েছিল বলেই তপন এয়ার ফোর্সে যেতে পারল।' এন-ডি-এ থেকে পাশ করার পর যোধপুর যাবার আগে ও কলকাতা এসেছিল। হাওড়া স্টেশনে ওকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে ওর বাবা মা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্কে চোখের জল ফেলেছিলেন। ওর চোখেও জল এসেছিল। মুখে কিছু বলতে পারেনি। পরে যোধপুর থেকে বাবাকে লিখেছিল, তুমি ডাক্তার। পাড়ার সবাই তোমাকে ভাল ডাক্তার বলেই জানেন কিন্তু তবুও তুমি জান ভাল চিকিৎসা করলেও সব রোগীকে বাঁচান যায় না। মৃত্যু সম্পর্কে আমার চাইতে তোমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী! মৃত্যু কিভাবে, কখন, কার কাছে আসবে সেকথা কেউ জানে না, জানতে পারে না।

আমার জীবনে মৃত্যু কিভাবে আসবে তা আমি জানি না, তুমিও জান না। শুধু জানি মৃত্যু আসবেই। কাল বৈশাখীর মত সে হঠাৎ আসবে, নাকি ভাদ্দুরে বর্ষার মত আসবে, তা জানি না। তোমাকে শুধু এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি আমি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভাল পাইলট হবার চেষ্টা করব। হবো, নিশ্চয়ই হবো। আর? আর যদি হঠাৎ কিছু হয়ে তাহলে নিশ্চিন্ত জেনো, মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও আমি তোমাদের গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করব।

তপন ভাল পাইলট হচ্ছে। হয়েছে! গ্রুপ ক্যাপ্টেন ভাল্লা পর্যন্ত ওকে বলেছেন, সরকার, এ্যাজ এ পাইলট তোমার ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল কিন্তু বী কেয়ারফুল। শুধু ভাল মেটাল হলেই ভাল অর্ণামেন্ট হয় না, তা তো জান?

জীবনটাকে নিয়ে ও খেলা করতে চায় না। ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও নয়। তাইতো যোধপুরে, হাকিমপেটে, আদমপুরে আনন্দ করেছে, উৎসবে মেতেছে কিন্তু উচ্ছ্বাসের দমকা হাওয়ায় ভেসে যায়নি। বিশ্বাস যখন হাকিমপেটে যাবার পরই নিজেকে নিয়ে পাগলামী করতে শুরু করল, তখন তপন পর্যন্ত চিন্তিত না হয়ে পারেনি। ছেলেদের জীবনে, পুরুষের জীবনে নারী চাই। নিশ্চয়ই চাই। অবশ্যই চাই। তবে শুধু সূর্যাস্তের পর রাতের অন্ধকারে কেন? তাইতো মিস ম্যাকডোনাল্ড যখন তামসী হলো, তখন সব চাইতে খুশী হয়েছিল তপন নিজে।

'আপনার জন্য সময়টা বেশ কাটল', বাড়ি ফেরার পথে সীতা তপনকে ধন্যবাদ জানায়।

সোজাসুজি উত্তর দিল না তপন। 'দেখুন অন্যায় যদি না করি তাহলে কল্যাণ হতে বাধ্য। শুধু একটুকু বলেই কি যেন ভাবতে লাগল।

ঠিক বুঝতে পারল না সীতা, হঠাৎ একথা বল্লেন?

'জীবনে কোন সন্ধ্যাই অন্যায়ভাবে নষ্ট করিনি। তাছাড়া এমন একটা সন্ধ্যার জন্য বহুদিন ধরেই আশা করছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। এমন সন্ধ্যা আমার জীবনে এই প্রথম।'

'তাহলে চট করে আমাকে ভুলতে পারছেন না, কি বলুন?'

'আপনি বুঝি আমাকে তাড়াতাড়ি ভুলে যাবেন?'

'আমার কথার এই অর্থ হয় বুঝি?'

'হয় না?'

'না।'

'তাহলে কি অর্থ হয়?' দুষ্টুমি করে তপন জানতে চায়।

সীতা বুঝতে পারে। লজ্জা পায়! 'জানি না।'

বালীগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে এসে বিদায় পর্ব সারা হলো! পাম এভিনিউয়ের

দিকে পা বাড়াবার আগে সীতা বল্লো বাড়ী গিয়ে অফিসিয়ালি একটা টেলিফোন। বুঝলেন ?

'বুঝলাম। আর কিছু বোঝাবেন ?'

'আস্তে আস্তে !'

'গুড নাইট !'

'গুড নাইট !'

দুজনেই খানিকদূর চলে যাবার পর হঠাৎ তপন ফিরে এলো। দৌড়ে ফিরে গেল সীতার কাছে। 'আচ্ছা আপনাদের টেলিফোনটা কার ঘরে ?'

'কেন বলুন তো ?'

'মাঝে মাঝে... মানে রাত্রের দিকে বা ভোরবেলায় টেলিফোন করলে বিপদে পড়ব নাকি তাই জানতে চাই।'

'টেলিফোনটা বসবার ঘরে আর তার পাশের ঘরেই আমি আর মিতুল থাকি।

'আপনার বাবা-মা ?'

'বাবা-মা'র ঘর এক কোণায়, খানিকটা দূরে।'

'তাহলে ?'

'ঘুমিয়ে না পড়লে টেলিফোন ধরব নিশ্চয়ই।'

'মিতুল...'

'ও নটা বাজতে বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে।'

'থ্যাংকস।'

বাড়ি ফিরতেই মা বল্লেন. এত দেরী হলো ?

'হবে না ? এরপর তো আরো দেরী হবে।'

তপন হাসতে হাসতে বল্লেও মা গম্ভীর হয়ে বল্লেন, তাহলে ছুটি নিলি কেন ?

ও এবার মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লো, তোমাকে জ্বালাতন করব না ? তারপর হঠাৎ মাকে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বৌদির টেলিফোন এসেছিল ?

'না এখনও আসেনি. তবে মিতুল দু'বার ফোন করেছিল। এক্ষুনি ফোন কর।'

'করছি।

মা চলে গেলেন। ও সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন না করে সারা ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। তারপর বারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। এই বারান্দাটা ওর খুব ভাল লাগে বরাবর। অনেক কিছু দেখতে পারে। আজও দেখছিল। বিভোর হয়ে দেখছিল।

'কিরে বাবুল, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে ? ফোন করেছিস ?' মা ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন।

'না করিনি। এক্ষুনি করছি।'

মা একটা প্লেটে দুটো বড় বড় সন্দেশ দিয়ে বল্লেন, এই দুটো খেয়ে নে। তোর জন্য তোর বাবা এনেছেন।

মিষ্টি খেতে খেতেই তপন টেলিফোন করল, আমি তপন সরকার কথা বলছি—

ওপাশ থেকে ফিস ফিস করে সীতা বল্লো, জানি।

তপন হাসছে। 'নমস্কার! কেমন আছেন?'

'খুব ভাল।'

'রিয়েলি?'

'তবে কি।'

'মিতুল কোথায়?'

'ও খেতে গেছে।'

'আপনি খেতে গেলেন না?'

'আজ ঠিক ক্ষিদে লাগেনি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

তপন একবার মার দিকে তাকিয়ে টেলিফোনে বল্লো, আচ্ছা মাকে খুব ঘুষ টুষ দিয়েছেন, তাই-না?

মা অবাক হয়ে ছেলের কথা শুনলেন। 'কি বাজে বকছিস?' সীতাও একটু বিস্মিত হয়ে বল্লো, কেন বলুন তো?

'ঘুষ না দিলে মা হঠাৎ আপনার আর মিতুলের এমন এ্যাডমায়ারার হলেন কিভাবে?'

মা আর সহ্য করতে না পেরে ছেলের হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'তুমি বাবুলের কথায় কিছু মনে করো না মা!'

সীতা আশ্বাস দেয়, 'না, না, মনে করব কেন?'

'ও বড্ড আজেবাজে বকে। কাকে কি বলতে হয় তা ও মোটেই জানে না।'

'আপনি এত করে কেন বলছেন? আমি কিছু মনে করিনি।'

'তুমি না হয় মনে করলে না কিন্তু অন্য কেউ হলে?'

সীতা কথার মোড় ঘুরায়, সে যাইহোক, ছোট ছেলেকে কাছে পেয়ে খুব খুশী তো?

'হ্যাঁ মা, তা তো ভালই লাগছে।'

'সারাদিন নিশ্চয়ই খুব আনন্দে কাটল?' সীতা মজা করল।

'ও কি বাড়ি থাকার ছেলে? এইত ফিরল।'

'তাই নাকি?' হাসি পায় সীতার। চেপে রাখে।

'সকাল থেকে বলছি, তোমাদের টেলিফোন করতে আর সেই টেলিফোন এখন করল।'

মিতুল খাওয়া সেরে ঘরে আসতেই সীতা ওকে টেলিফোন দিয়ে বল্লো, 'নতুন দিদা। কথা বল।'

'হ্যাঁ দিদা, কাকু এসেছে?'

'হ্যাঁ। এইত পাশে বসে।'

'একটু দেবে?'

নাও।'

মা তপনকে টেলিফোন দিয়ে বল্লেন, এই যে মিতুল।

'বলো মিতুল পুতুল কেমন আছে?'

'আমি মোটেই পুতুল না।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি কখন এসেছ কাকু?'

'সকালে। তবে একটু জরুরী কাজে গিয়েছিলাম বলে তোমাকে টেলিফোন করতে পারিনি।'

'আমি তোমাকে দু'বার টেলিফোন করেছিলাম।'

'হ্যাঁ শুনলাম। আমাকে না পেয়ে খুব রেগেছ নিশ্চয়ই?'

'রাগ করিনি কিন্তু ভেবেছিলাম তুমি আসবে।'

'আসব। নিশ্চয়ই আসব।'

'তুমি রোজ আসবে।'

'রোজ?'

'হ্যাঁ। রোজ বেড়াতে যাব কেমন?'

'তোমার দাদু-দিদা আর মাসী যদি রাগ করেন।'

'তোমার সঙ্গে বেড়ালে কেউ রাগ করবে না। তাছাড়া মাসীও আমাদের সঙ্গে যাবে।'

'তোমার স্কুল আছে তো?'

'কাল তো স্পোর্টসের ছুটি। তাছাড়া আমাদের তো দুটোয় ছুটি হয়।'

'ঠিক আছে।'

'কাল সকালেই তুমি আসছ তো?'

'তুমি মাসীকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এসো। তারপর এখান থেকে বেড়াতে যাব।'

'তুমি একবার মাসীকে বলে দাও।'

তপন টেলিফোনটা মাকে দিয়ে বল্লো, 'মা, ওদের আসতে বলো।'

মা বল্লেন, সীতা, মা, কাল সকাল সকাল মিতুলকে নিয়ে চলে এসো। তারপর এখান থেকে খাওয়া-দাওয়া করে বেড়াতে যাবে।'

সীতা আপত্তি করতে পারেনি। করবে কেন? ক'দিনের মেলামেশা আর যাতায়াতের মধ্যে দিয়ে ওর বেশ লেগেছে ওঁকে। ওর মারফত ছেলের

খবরাখবর পেয়ে সরকার গিন্নী দারুণ সন্তুষ্ট হয়েছেন। এয়ার ফোর্সের পাইলটের কাজটাই বেশ দুশ্চিন্তার। তারপর দূরে দেশে থাকে। সেই ছেলের খবর পেলে কোন মা খুশী হবেন না? তাছাড়া দুই ছেলেই বাইরে। স্বামীও অধিকাংশ সময়ই বাড়ীর বাইরে থাকেন। বড় বেশী একলা একলা মনে হয়। সীতার সঙ্গে গল্প করে, মিতুলকে একটু আদর করে মন ভরেছে। নিঃসঙ্গতার বেদনা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ভুলতে পেরেছিলেন। মিতুল আর সীতার ভাল লেগেছিল তপনের মাকে। নিঃস্বার্থ স্নেহের কাছে ওরা আত্মসমর্পণ না করে পারেনি। এখনও পারল না। 'কিন্তু মাসীমা আমাদের যাওয়া মানেই তো আপনাকে জ্বালতন করা।'

সরকার গিন্নী হাসতে হাসতে বল্লেন, এমন জ্বালাতন রোজ করতে পারো না?

অনেক রাত্রে দুর্গাপুর থেকে ট্রাংককল এলো। বৌদির টেলিফোন। টুকটাক সাধারণ কথাবার্তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সীতার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

তপন চমকে ওঠে। একটু সামলে বলে, 'ওর সঙ্গে দেখা হবার কি আছে?'

'কিছু নেই বুঝি? আদমপুর থেকে ঘুরে আসার পর থেকে ও শুধু শুধুই আসা-যাওয়া করছে?'

'শান্তাবৌদির চিঠিতে আমার খবর থাকে বলে মাকে তা জানাতে আসে...'

'নিছক কর্তব্য করতে আসে, তাই না ঠাকুরপো?'

'তুমি কবে আসছ?'

'এক্ষুনি আসব না।'

'কেন?'

'অনেক দিন পর দেখা হলো। একটু প্রাণ খুলে মেলামেশা, কথাবার্তা বলো। তারপর মন একটু শান্ত হলে আমি আসব।'

'তুমি বেশ রোমাণ্টিক হয়েছো তো!'

'আমি রোমাণ্টিক না হলে তোমার এসব অ্যাপ্রিসিয়েট করবে কে?'

দাদার সঙ্গে একটু কথা বলার পর লাইন কেটে গেল।

বহু প্রত্যাশিত কলকাতার প্রথম দিন শেষ হলো। যা কল্পনা ছিল, তা সম্ভাব্য হলো।

পরের দিন সকালে প্রথমে বৃন্দাবন তারপর মা অনেকবার চা নিয়ে ডাকাডাকি করলেন। তপন উঃ আঃ করল, পাশ ফিরে শুয়ে এক আধবার চোখ মেলে দেখল কিন্তু উঠল না। মা আর ডাকলেন না। ভাবলেন, কাল রাত্রে গল্প-গুজব করে শুতে শুতে তো অনেক রাত হয়েছে। আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকুক।

ডাঃ সরকার ডিসপেন্সারী চলে গেলেন। বৃন্দাবন বাজারে গেল। সরকার গিন্নী বাথরুমে ঢুকলেন কিন্তু কলিংবেলের আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সীতা আর মিতুলকে দেখে খুশী হয়ে বল্লেন, 'তোমরা এসে গেলে আর বাবুল এখনও ঘুমুচ্ছে।'

সীতা হাসল। মন্তব্য করল 'মিতুল, সে কি? কাকু আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাবে না?'

মিতুলের গাল টিপে আদর করে সরকার গিন্নী বল্লেন, 'নিশ্চয়ই যাবে। আর ও না নিয়ে গেলে আমি তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব, বুঝলে দিদা?' এবার সীতাকে বল্লেন, 'ঐ ডানদিকের ঘরে ও ঘুমোচ্ছে। তোমরা গিয়ে ওকে ওঠাও তো, আমি স্নান সেরে আসছি।'

সরকার গিন্নী আবার বাথরুমে ঢুকলেন। ওরা দুজনে বসবার ঘরে গেল। ডানদিকের ঘরের দিকে একবার তাকাল সীতা। ইচ্ছা করলেও যেতে পারল না। 'যা তো মিতুল তোর কাকুকে উঠতে বল।' তারপর প্রায় মনে মনে বল্লো, ন'টা বেজে গেল। কি ঘুম বাবা!

মিতুল গেল। কয়েকবার 'কাকু' 'কাকু' করে ডাকল কিন্তু তবু কাকুর ঘুম ভাঙল না। বাইরের ঘরে এসে সীতাকে বল্লো, জান মাসী, উঠল না। তুমি খুব জোরে জোরে ডাক দাও, তাহলে উঠবে।'

'ঘোড়ার ডিম উঠবে।'

'বলছি উঠবে। তুমি ডাকো না!'

তুই আরেকবার ভাল করে ডাক দে। তারপর না উঠলে আমি যাব।'

'আমি তো এক্ষুনি ডাকলাম। তুমি যাও।'

কাউকেই ডাকতে হলো না। হঠাৎ ও ঘর থেকে তপনের গলা শোনা গেল, কে?

মিতুলের আগেই সীতা জবাব দিল, ভূত।

'ভূত!'

মিতুল ঘরে ঢুকে পড়ল। বল্লো, তুমি এখনো ঘুমুলে কখন বেড়াতে যাব?

পিছন পিছন সীতা এলো। 'জানিস মিতুল, বোধহয় আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা নেই।'

তপন তখনও শুয়ে। চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে হাসি মুখে বল্লো জানো মিতুল, তোমাদের এই ঘরের মধ্যে পেলে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা নেই।

সীতা চোখ টিপে ইসারা করল মিতুল রয়েছে।

তপন হাত বাড়িয়ে মিতুলকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লো, 'আচ্ছা মিতুল, ঘরের মধ্যে বসে বসে গল্প করতে খুব ভাল লাগে না?'

ও মাথা দোলাতে দোলাতে বল্লো, বেড়াতে বেড়াতে গল্প করব। তুমি ওঠো।

'দাঁড়াও একটু চা খাই।'

সীতা তখনও বসবার ঘর আর তপনের ঘরের মাঝখানের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তপন এবার ওকে ডাক দিল, চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন!

'বসলেই দেরী হবে। আপনি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন।'

'মা কোথায়?'

'মাসিমা বাথরুমে।'

'মা বেরুলেই আমি তৈরী হচ্ছি। আপনি একটু তো বসুন।'

সীতা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চেয়ারটা টেনে বসল।

এবার তপন মিতুলকে বল্লো, 'মিতুল, দিদা বাথরুম থেকে বেরুলেই আমাকে ডাক দিও তো'।

মাথা কাত্ করে চোখ দুটো বড় বড় করে মিতুল বল্লো 'আমি ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আসবে, বুঝলে?'

'নিশ্চয়ই আসব।'

মিতুল ঘর থেকে ভিতরের বারান্দায় চলে যেতেই সীতা উঠে দাঁড়াল, আমিও যাচ্ছি।'

তপন শুধু হাত দিয়ে ইসারা করে বসতে বল্লো।

'না, না, মাসিমা কি ভাববেন?'

'কিচ্ছু ভাববেন না, বসুন।'

সীতা বসল।

তপন চাদরের ভিতর থেকে ডান হাতটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিল।

'কেন?'

'হ্যান্ডসেক করব। আর কিছু না।'

'কিছু বিশ্বাস নেই।'

'অবিশ্বাসের মত কিছু করেছি?'

'না করলেও ভবিষ্যতে যে করবেন না তার কি ঠিক আছে?'

'ভবিষ্যত নিয়ে ভবিষ্যতে ঘাঁটা ঘাটি করা যাবে। হাতটা দিন।'

সীতা হাত বাড়ালো। তপন হাতের মুঠোর ওর হাত নিয়ে বল্লো, মেনি মেনি থ্যাংকস্ ফর্ লাস্ট ইভনিং।'

সীতা এবার উঠে দাঁড়াল। 'আমি ও ঘরে বসছি। আপনি তৈরী হয়ে নিন।'

'আচ্ছা, হঠাৎ যদি এই ঘরের মধ্যে শান্তাবৌদি আসে?'

'জানি না।' লজ্জায় মুখ নিচু করে সীতা বল্লো।

'আমি জানি।'

'কি জানেন?'

'দারুণ খুশী হবে।'

ও আর দেরী করল না। বসবার ঘরে চলে গেল।

তপন চুপি চুপি পা টিপে টিপে এসে সীতার পাশে চাপা গলায় বলে, এখনও এত লজ্জা ?'

মুখ নিচু করেই সীতা জানতে চাইল, 'এখনও মানে ?'

'এত দূর এগুবার পরও লজ্জা ?'

'আমি এগিয়েও যাইনি, পিছিয়েও আসিনি।'

'স্বীকার করতে এত দ্বিধা, এত সংকোচ ?'

শুধু সীতা কেন, ভোরের সূর্যও লজ্জায়, দ্বিধায় রক্তিম হয়। তারপর আলোছায়া আর মেঘ-রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ধীরে ধীরে সে লজ্জার আবরণ সরে যায়। মুক্ত হয় দ্বিধা সংকোচ থেকে। বিদায় নেয় জড়তা। তারপর সে সম্রাট। সে মধ্য গগনের সূর্য। মুক্ত মহাপুরুষ। সে যৌবন। সে মুক্ত প্রেম, সংশয়হীন ভালবাসা। সে ঐশ্বর্য। সে মহাজীবন।

সূর্য তো প্রাণহীন অগ্নিবলয় মাত্র। আর মানুষের মন ? সে শত-সহস্র অনুভূতির মালা। অসংখ্য রাগ-রাগিনীর সঙ্গমতীর্থ। দ্বিধা আর সংকোচ থেকে মুক্ত হবার পর নতুন বন্ধনেই তার মুক্তি ! প্রাণের বন্ধন। প্রেমের বন্ধন সেই বন্ধনেই প্রাণের শান্তি, মনের তৃপ্তি।

বন্দিনী হয়েও সীতা সম্রাজ্ঞী হলো।

॥ সাত ॥

পুণায় পোস্টিং অর্ডার পেয়ে তপনের খেয়াল হলো কলকাতার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েকটা দিন। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। না হয়ে পারল না।

মা পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিতে দিতে সান্ত্বনা জানালেন 'কিরে বাবুল ! এত ভাবছিস কেন ?'

মামুলি জবাব দেয় তপন, না ! ভাবছি না :

'তুই বাপু এবার বিয়ে থা কর। আর কতকাল এমনি একলা একলা কাটাবি ?' মা একটু থামলেন. তাছাড়া মেসে-টেসে খেয়ে কি শরীর থাকে ?'

তপন কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল। রোজই এমন সময় বেরিয়ে যায়। সীতার সঙ্গে ঘুরতে যায়। বেড়াতে যায়। কোনদিন দেরী হয়। কোন কোনদিন আবার তাড়াতাড়ি সীতাকে নিয়েই তপন বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ীতে বসে বসেই গল্প করে। মজা করে।

'আচ্ছা মা, সীতার নাকটা কি বিশ্রী চ্যাপ্টা, তাই না ?'

ছেলের কথায় মা সত্যিই রেগে যান, 'ফের যদি এইসব বাজে কথা বলিস তাহলে তুই মার খাবি।'

সীতা হাসতে হাসতে শুধু বলে, 'মাসীমা. আপনার যদি মায়া হয় তাহলে আমিই মারতে পারি।'

মা হাসেন। সীতা হাসে। হাসে না তপন। বেশ সিরিয়াসলি বলে, 'নাকটা চ্যাপ্টা অথচ বলতে পারব না?'

মা রেগে যান, 'তোদের ঐ নাক নিয়ে আর অন্যের সমালোচনা করিস না।'

সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরল না। ফিরতে পারল না। তপনকে দেখেই সীতা বুঝতে পারল কিছু হয়েছে।

'কি ব্যাপার? তুমি কি ভাবছ বলতো!'

'ভাবছি নাকি?'

'নিশ্চয়ই।'

'কি করে বুঝলে?'

'তোমাকে দেখেই বুঝেছি।'

শুনে খুশী হলেও একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ফেলে পারল না তপন। 'আজ পোস্টিং অর্ডার পেলাম।'

একটু উত্তেজিত হয়ে দারুণ আগ্রহের সঙ্গে সীতা জানতে চাইল, কোথায়?

'পুণায়।'

'তার জন্য এত ভাবছ কেন?'

'কত দূরে বলতো।'

সীতা, একটু হাসল, দূরে থাকলেই কি দূরে চলে যাবে।

এবার তপনও একটু হাসল, ওখানে কে আমার সঙ্গে এমন সুন্দর করে কথা বলবে, বলতে পার?

'দরকার হবে না।'

'কেন?'

'মনের কথা শোনার জন্য কাছে থাকতে হয় না।'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তপন সীতাকে দেখে। অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে। সীতার একটু লজ্জা হয়। লজ্জায় চোখের পাতা পড়ে। তারপর মুখটা একটু নিচু করে বলে, 'আর কি আমাকে দেখতে পাবে না যে অমন করে দেখছ?'

তপন গম্ভীর হয়ে বলে, 'তোমাকে যত দেখছি, যত মিশছি ততই অবাক হচ্ছি।'

'কেন বলতো?'

'তুমি এত সুন্দর কথা বলো কেমন করে বলতো?'

বেশ জোরে হেসে ওঠে সীতা, 'সত্যি সুন্দর কথা বলি?'

'তবে কি?'

সীতা একটু আনমনা হয়ে উদাস দৃষ্টিটা দিকচক্রবাল রেখার ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বলে, 'আগে কিন্তু আমি একদম কথা বলতে পারতাম না।'

তপন হাত দিয়ে ওর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে এখন বল কেমন করে?

চোখের কোনায় ঠোঁটের পাশে একটু দুষ্টু মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বল্লো, 'সত্যি বলব?'

'বল।'

'কাছে এসো।'

তপন কাছে এলো। 'এবার বল।'

'আমার দিকে তাকাবে না। ওদিকে মুখ ঘুরাও।'

'এমন কি কথা যে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে পার না?'

'বেশ। অসুবিধে হলে থাক কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমিও বলতে পারব না।'

তপন সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, এবার হয়েছে?

সীতা দু'হাত দিয়ে ওর মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, তুমিই তো আমাকে কথা বলতে শিখিয়েছ।

ও প্রায় লাফ দিয়ে ওঠে, 'আমি তোমাকে কথা বলা শিখিয়েছি?'

'নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই?'

'তোমাকে এমন করে না পেলে কি কথা বলতে পারতাম?'

'এমন করে পাওয়া মানে?'

'জানি না।'

তপন ডান হাত ঘুরিয়ে ওকে একটু কাছে টেনে নেয়। আব্দার করে, লক্ষ্মীটি বল না।

'তুমি কিছু বোঝ না!'

সত্যি তপন বুঝতে পারে না। পরিপূর্ণ প্রেমে নারী শতদলের মত প্রস্ফুটিত হয়? অনেক অজ্ঞাত রূপ রস আত্মপ্রকাশ করে। অনুভূতি ভাষা পায়, স্বপ্ন রূপ নেয়। তপন এসব জানে না, বোঝে না কিন্তু কিছুটা অনুভব করতে পারে। অনুভূতি যখন তীব্র হয়, ভাষা তখন আপন বেগে এগিয়ে আসে। আসবেই। সীতারও এসেছে।

'তুমি ঠিক বলেছ সীতা, আমি অনেক কিছুই বুঝি না। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছি তোমাকে পেয়ে আমার সব অভাব, সব দৈন্য মিটে যাবে।

সীতা চুপ করে থাকে।

ফাইটার পাইলটদের কাজটা বড়ই রিস্কি। মুহূর্তের ভুলে মহা সর্বনাশ হয়ে যায়। মনে অশান্তি থাকলে জজ্-ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করা যায় কিন্তু ভাল ফাইটার পাইলট হওয়া যায় না। ঘরের অশান্তির জন্য কত পাইলটের জীবন নষ্ট হয়।

মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হয় সীতার মুখটা। 'আঃ! ওসব কথা রাখ।'

মোড় ঘুরিয়ে নেয় তপন, 'তোমার ভয় নেই। তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আমার জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না।'

সীতা দু'হাত দিয়ে তপনের হাত চেপে ধরে বলে 'তুমি সত্যিই তাই মনে কর?'

'নিশ্চয়ই।' একশ' বার, হাজার বার মনে করি।'

'আমাকে নিয়ে, তোমার কোন দুঃশ্চিন্তা নেই?'

'বিন্দুমাত্র না।'

এয়ার ফোর্সে তপনের অভিজ্ঞতা খুব দীর্ঘদিনের নয়। কিন্তু তবু কিছু দেখেছে, কিছু শুনেছে। জেনেছে পারিবারিক অশান্তির জন্য কত ভাল ভাল পাইলট জীবন মধ্যাহ্নেই চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে। কিছু কিছু পাইলট শুধু মদ খেয়ে সব দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করে। পারে না। হেরে যায়। কেউ আগে, কেউ পরে। তাইতো হঠাৎ কোন মোহে ভেসে যায়নি ও। ভেসে যেতে পারেনি। চায়নি। সীতা মোহ নয়, পরিপূর্ণ জীবন। সে যুবতী কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মত মাতাল নয়, সে গঙ্গার মত শান্ত, সমাহিত। পবিত্র।

'শান্তাবৌদির কোন চিঠি পেয়েছ?'

'মার কাছে এসেছে।'

'কি লিখেছে?'

'ঠিক জানি না, তবে মনে হয় তোমার আমার বিষয়েই কিছু লিখেছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'বাবা মার কথাবার্তা শুনে মনে হলো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বোধহয় মাসীমার কাছেও দিদি চিঠি দিয়েছে।'

'শান্তাবৌদি তাহলে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

'তাই মনে হয়। তাছাড়া মা বলছিলেন আর এম. এ. পড়তে হবে না।'

'কেন? তোমার মা কি ভাবছেন আমি পালিয়ে যাব?'

সীতা দুষ্টুমি করে বলে, 'তোমার মত ইয়ং এ্যান্ড হ্যান্ডসম অফিসারদের কি খুব বেশী বিশ্বাস করা উচিত?'

'তোমার মত আগলি মেয়ে নিয়ে অবশ্য কোন দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই, তাই না সীতা?'

'ঠিক বলেছ।'

'তুমি আগলি বলেই তো আমাকে পাগল করে তুলেছ।'

'ওসব কথা ছাড়। এইত সেদিনও তুমি আমার নাক চ্যাপ্টা বলে মাসিমার সঙ্গে কত তর্ক করলে।'

'শুধু নাকটাই না হয় চ্যাপ্টা, আর কিছু তো চ্যাপ্টা নয়।' হাসি চেপেই তপন বল্লো।

সীতা তপনের পিঠে একটা চড় মেরে বল্লো, 'আবার অসভ্যতা !'

'আমি অসভ্য ? অবাক হবার ভান করে তপন।

'তুমি অসভ্য হবে কেন ? আমিই অসভ্য।'

'তা তো বলিনি।'

'তুমি সভ্য বলেই তো সেদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অমন করে......'

তপন বাধা দেয়, 'ওটা কি অসভ্যতা ? ওতো নিতান্তই সাধারণ কর্তব্য পালন করছিলাম মাত্র।'

'ফর গডস্ সেক ! এত কর্তব্যপরায়ণ হয়ো না।'

'তাই কি হয় ? কর্তব্যচ্যুত হওয়া কি ঠিক ?'

'এসব কর্তব্য পালনের জন্য খুব উৎসাহ, তাই না ?'

'আমার বদলে অন্য কেউ হলে এর মধ্যে আরো কত কর্তব্য পালন করত, জান ?'

'দরকার নেই অমন কর্তব্য পালনে।' সীতা একটু থেমে বলে, 'তোমার খুব সাহস বেড়ে গেছে, তাই না ?'

'সেদিন সিনেমা দেখতে দেখতে...'

'আবার অসভ্যতা ?'

'বলছি সাহস তো তুমিই বাড়িয়ে দিয়েছ।'

'বেশ করেছি এবার চুপ কর।'

একটু চুপ করে দুজনেই। তারপর সীতা হঠাৎ বলে, 'জান, কোন আর্মি বা এয়ার ফোর্স অফিসারের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে বাবা-মার একটুও মত ছিল না।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ। সত্যি বলছি...'

'তাহলে ?'

'অত ঘাবড়াতে হবে না। তোমাকে দেখার পর, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর দুজনেরই মত পাল্টে যায়।'

'গুড গুড ! যদি ওঁদের মত না হতো ?'

'যদির কথা ভাবতে হবে না।' সীতা একবার তপনকে দেখে নিয়ে বল্লো, 'এখন তো বাবা মা-ই আমার চাইতে তোমার বেশী এডমায়ারার।'

'খুবই ন্যাচারাল !' আত্মগর্বের হাসি হাসতে হাসতে তপন বল্লো।

'ন্যাচারাল কেন ?'

'আমার মত জামাই হলে খুব সুন্দর সুন্দর নাতী-নাতনী পাবেন বলে...'

তপনের পিঠে একটা ঘুষি মেরে সীতা বলে, 'আবার অসভ্যতা ?'

'বাঃ ! অসভ্যতার কি আছে। তোমার ছেলেমেয়ে হবে না ?'

'থাক, সে চিন্তা এখন না করলেও চলবে।'

'পাগল নাকি ? আমার মাথায় তো এখন শুধু ঐ একটাই চিন্তা'

'উঃ। কি অসভ্য ছেলে বাবা।'

তপন যেন হঠাৎ সিরিয়াস হয়, 'আচ্ছা সীতা তোমার কাছেও আমি প্রাণ খুলে কথা বলব না ?'

সীতা দু'হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে 'বলে নিশ্চয়ই বলবে।' একশ বার বলবে। শুধু আমার কাছেই তো সব কথা বলবে।'

'তাহলে তুমি আমাকে অসভ্য বলো কেন ?'

'আর বলব না কোনদিন বলব না, কেমন ?'

স্বপ্নের মত কটা দিন কেটে গেল। একদিন তপন আর ওর মা সীতাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেলেন। হাতে একটা সিরিয়াস পেসাণ্ট থাকায় ডাঃ সরকার যেতে পারলেন না। যাবার আগের দিন রাত্রে সীতাদের বাড়ীর সবাই এলেন তপনদের বাড়ী। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্প গুজব হলো। দুর্গাপুর থেকে দাদা-বৌদি আসায় আসর আরো জমেছিল। আসর ভাঙ্গবার মুখে তপনের বৌদি সীতার মাকে বল্লেন, মাসীমা ঠাকুরপোর বিয়ের ব্যাপারে একটা ছোট্ট দাবী আছে।

বৌদির কথায় সবাই একটু অবাক।

সীতার মা বল্লেন, 'বল মা, কি তোমার দাবী।'

'ছুটি হলে সীতাকে কদিন আমার কাছে পাঠাতে হবে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লেন সীতার মা, 'নিশ্চয়ই যাবে।'

পরের দিন বোম্বে মেলেই তপন রওনা হলো। বিদায় জানাতে দু'বাড়ীর সবাই এসেছিলেন। ঐ ভীড়ের মধ্যেই বৌদি একবার ওদের দুজনকে একপাশে নিয়ে ফিস ফিস করে বল্লেন, 'এর পরের বারই তো দুজনে মিলে কুপে'তে যাবে ! কি মজা, তাই না ?'

তপন ন্যাকামী করে, 'দুজনে মিলে খুব মজা হয় বুঝি ?'

বৌদি সীতাকে বল্লেন, 'হ্যাঁ সীতা, এ যে সত্যি সত্যিই রামচন্দ্রের মত কথাবার্তা বলছে !'

সীতা হাসতে হাসতে দূরে সরে গেল।

হাওড়া স্টেশনের অসংখ্য মানুষের জনকোলাহলের মধ্যেও একটা দ্বৈত সঙ্গীতের সুর বেজে উঠল। জীবন সঙ্গীত। অশ্রুতপূর্ব নতুন এই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মদির হয়ে উঠল তপন আর সীতার মন। ঠিক কখন যে বোম্বে মেল ছাড়ল, তা যেন ওরা বুঝতেই পারল না। নতুন দিনের স্বপ্নে এমনই মদির হয়েছিল ওদের মন যে, সাময়িক বিচ্ছেদের বেদনা কাউকেই স্পর্শ করতে পারল না। অনেকটা ক্লোরোফর্ম করে পেট কাটার মত। যখন খেয়াল হলো তখন বোম্বে মেল অনেক দূরে চলে গেছে।

পুণা।

সমস্ত সরকারী অফিসের মধ্যেই যেমন একটা মিল আছে, তেমনি সব এয়ার ফোর্স স্টেশনের মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য আছে। থাকে। থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তবু পশ্চিমঘাট পর্বতের মাঝে নিজেকে পেয়ে ভাল লাগল তপনের। ভাল লাগল নানা কারণে। সবুজ পাহাড়ের মেলা আর সমুদ্রকে প্রায় একসঙ্গে পেয়ে সত্যি বড় ভাল লাগল। সাধারণ মানুষ শুধু পাহাড় দেখতে পায় কিন্তু ওরা টেক অফ্ করার পনের মিনিটের মধ্যেই সমুদ্রের উপর এসে যায়। ভ্যাম্পায়ারের কক্‌পিটে বসেও উদার প্রকৃতির রূপের বন্যা না দেখে পারা যায় না। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ আরব সাগর যেন ডাঙ্গায় উঠেও নাচছে। নাকি যুগ যুগ ধরে আরব সাগরের ঢেউ লেগে সারা পশ্চিমঘাটই তরঙ্গের মত হয়ে গেছে?

কর্মজীবন আগের মতই ছকে বাঁধা। সূর্যোদয় থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত ভ্যাম্পায়ার নিয়ে খেলা করতে হয়। রোজ। প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি। তবুও তিক্ত হয় না মন। বরং ভাল লাগে। ঐ এক পাহাড় আর দূরের সীমাহীন সমুদ্র যেন রোজ সাজ বদলায়। অনেকটা সীতার মত। কলকাতায় রোজ দেখা হতো কিন্তু তবু রোজ নতুন করে ভাল লাগত। সকালে নতুন লাগতো, দুপুরে নতুন লাগতো, সন্ধ্যায় নতুন লাগত।

'জান সীতা, তুমি দিনে সূর্যমুখী রাতে হাস্নাহানা।'

'তার মানে?'

'তুমি দিনে ইন্দ্রানী. রাতে উর্বশী।'

'কোন বদ মতলব আছে নাকি? এত ফ্লাটারি করছ!'

'কোন মতলব নেই· ··'

'তবে হঠাৎ এত বিশেষণে ভূষিতা করছ আমাকে?'

'তুমি যেন অনেকটা 'প্রিজম্' এর মত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সাধারণ তিন কোনা কাঁচ। অথচ কত রং. কত রূপ লুকিয়ে থাকে ওরই মধ্যে।'

পুরাতন স্কোয়াড্রন কিন্তু নতুন করে কাছে পেল বিশ্বাসকে। বছর দেড়েক পরে কাছাকাছি পেয়ে দুই বন্ধুই দারুণ খুশী। বিশ্বাস অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেছে। ফ্লাইং ছাড়া সবসময় বই নিয়ে বসে থাকে। উইক-এন্ড ছাড়া ড্রিঙ্ক করে না বললেই চলে। তাও বড় জোর দু'তিন পেগ। জুলাইতে একজাম 'বি' দিয়েই তামসীকে বিয়ে করবে। নিজেই বাড়িতে জানিয়েছে! মাকে লিখেছিল. 'তামসীকে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে তোমরা আমাদের যে শাস্তি দেবে. আমরা তাই মাথা পেতে নেব কিন্তু যদি পছন্দ হয়, তাহলে ওকে মর্যদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করো না।'

তোর ঐ চিঠির জবাবে মাসিমা কি লিখলেন?' তপন জিজ্ঞাসা করল।

হাতের বইটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বিশ্বাস একটু হাসল।

'বাড়ীর সবাই তো আমাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিল তাই মা আর আপত্তি করেন নি।'

'একদিন গড়িয়াহাটার মোড়ে তোর দাদা-বৌদির সঙ্গে দেখা……'

'তাই নাকি?'

'আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাই বিশেষ কথা বলতে পারলাম না, তবে বৌদি আমাকে একটু পাশে নিয়ে তোর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি শুধু বললাম কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই।'

'দাদা-বৌদি তো বোম্বে এসেছিল।'

'কেন?'

'তামসীকে দেখতে।'

'তামসীকে দেখতে বোম্বে?' তপন অবাক হয়।

'হ্যাঁ। ও তো এখন বোম্বেতে।'

'আগে জানলে দেখা করে আসতাম।'

নেক্সট্ উইকে নিয়ে যাব।'

'ও চাকরি করছে না?'

'না। ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

'এখন কিছু করছে?'

'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার অফিসে একটা মোটামুটি ভালই কাজ পেয়েছে।'

'আচ্ছা?'

'হ্যাঁ। আমার চাইতে ও এখন বেশী ওয়েল অফ্।'

'ইজ ইট?'

'প্রায় ছ'শ টাকা পাচ্ছে।'

তপন খুব খুশী হয়। 'তাহলে তামসী এখন বেশ বড়লোক।

'রোজগার করলে কি হয়! ভীষণ কৃপণ হয়েছে।'

'হঠাৎ?'

'বোম্বেতে ফ্ল্যাট কিনবে ফর ফিউচার রেনি ডেজ।'

'ওয়াণ্ডারফুল!'

'বুদ্ধিটা অবশ্য ওর নয়……'

'তবে কার?'

'গিলের চেষ্টাতেই ও চাকরিটা পায়··'

'আমাদের গিল?'

'হ্যাঁ। ওর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে 'টাইমস্' এর বড় কর্তাদের খুব ভাব। চাকরিটা পাবার পরই গিল ওকে বললো মাসে মাসে পাঁচশ টাকা হাউসিং-কো অপারেটিভ সোসাইটিতে জমা রাখতে·'

এই গিল একটা বিচিত্র ছেলে। প্রায় দুর্লভ। কত মানুষের কত সুখ-

দুঃখের চিন্তা যে ও নিজের মাথায় তুলে নিতে পারে, তা ভাবলেও অবাক লাগে। কোন ক্লান্তি নেই, কোন বিরক্তি নেই। কোন বাছ-বিচারও নেই।

অফিসার্স ক্লাবে পার্টির মাঝখানেই স্কোয়াড্রন লীডার সকসেনা টেলিফোন পেলেন, পরের দিন সকালেই এয়ার কমোডরের সঙ্গে পুণা যেতে হবে। টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রেখে ভীড়ের মধ্যে স্ত্রীকে খুঁজে বের করে বললেন, সাবিত্রী, কাল সকালেই পুণা যেতে হবে। বাড়ী ফিরেই নতুন ইউনিফর্ম আর সবকিছু গুছিয়ে দিও।

সাবিত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাল সকালেই ?

'হঁ্যা।

'ক'টায় তোমাদের ডিপারচার ?'

'সাতটা নাগাদ হবে কারণ ন'টায় কনফারেন্স শুরু।'

তখন রাত প্রায় দশটা। হাতের ঘড়িটা দেখে চমকে উঠল। নতুন ইউনিফর্ম দর্জির কাছ থেকে আনা হয়নি। ভুলে গেছে। অথচ দোকান তো অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। মিসেস ভাটিয়া বললেন, 'এত ঘাবড়িও না, বোধহয় গিল ম্যানেজ করতে পারবে।'

ঘণ্টা দুই ঘুরাঘুরি করে গিল স্কোয়াড্রন লীডার সকসেনার নতুন ইউনিফর্ম উদ্ধার করেছিল।

বাচ্চাদের স্কুল ইউনিফর্মের কাপড় কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না ? বোম্বের দুটো থ্রি-টায়ার স্লিপার টিকিট চাই ? অস্টিনের অরিজিন্যাল ক্লাচ্-প্লেট পাওয়া যাচ্ছে না ?

এ সবকিছুর জন্যই গিল। যেভাবেই হোক একটা ব্যবস্থা করবেই। ওর ছোট ভাইও ঠিক ঐ ধরনের হয়েছে। হবে না কেন ? অমন মা'র ছেলেরা ভাল হবে না ? আদমপুরে থাকার সময় মাঝে মাঝে নানা কাজে তপন দিল্লী এসেছে। একবার ও আর গিল্ একসঙ্গে আসে। পালামের অফিসার্স মেসে তপনকে কিছুতেই থাকতে দিল না গিল। টেনে নিয়ে গেল ওদের ওল্ড রাজেন্দ্রনগরের বাড়িতে। প্রথম দেখা হবার পরই বৃদ্ধা বিধবা ওকে বলেছিলেন, তুমি যখন কাকার দোস্ত তখন আমিও তোমার মা, তুমিও আমার ছেলে। বুঝলে ?

চমকে উঠেছিল তপন। এমনভাবে মাতৃত্বের অধিকার দান করতে বিশেষ কাউকে দেখেনি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো, নিশ্চয়ই।

'দিল্লীতে এসে যদি কোনদিন মেসে থেকেছ তাহলে কিন্তু আমার কাছে সত্যি সত্যিই বকুনি খাবে।'

এই পৃথিবীতে সামান্য কিছু মেয়ে আছেন যাদের মা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। ভাবা সম্ভব নয়। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা যায় না, শুধু আত্মসমর্পণ করা যায়। ঐসব অনন্যাদের কাছে হাসি মুখে পরাজয় বরণ করাই জীবনের সব

চাইতে বড় জয়লাভ। কৃতিত্ব। সার্থকতা। গিল-জননী ঠিক একজন অনন্যা অসামান্যা।

'জান তপন, ছোট্ট দুটো ছেলেকে নিয়ে বিধবা হই। প্রথমে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। শোকটা একটু সামলে নেবার পর ভাবলাম, জীবনে তো কোন অন্যায় করিনি। সুতরাং ভয়ের কি আছে? আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। জীবনে অনেক পরিশ্রম করেছি কিন্তু কষ্ট হয়নি।'

ছোট্ট ঘরের দুটো খাটিয়া। একটায় মাতাজী বসে, অন্যটায় ওরা দুজনে। চুপচাপ।

'স্বামীকে হারাবার চাইতে বড় দুঃখ কোন মেয়ে পেতে পারে না ঠিকই। তবে আজ মনে হয় ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। স্বামীকে না হারালে তোমাদের মত এতগুলো সুন্দর সুন্দর ছেলে পেতাম না। এই দুনিয়ায় কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয়।'

বৃদ্ধা ওদের দিকে একবার দেখলেন। একটু হাসলেন। তারপর একটু উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে কি যেন দেখতে দেখতে বললেন, রামচন্দ্র যদি রাজত্ব না ছাড়তেন, যদি সীতাকে না হারাতেন তাহলে কি রাবণ জয় হতো? নাকি আবার অযোধ্যা ফিরে পেতেন? পঞ্চপাণ্ডবরাও সর্বস্ব হারিয়েছিল বলেই সব কিছু ফিরে পেয়েছিল। দুর্যোধন কিছু ত্যাগ করেননি বলেই সব কিছু হারালেন।

বিশ্বাসের কথা শুনেই তপনের মনে পড়ল এই সব কথা, এই সব স্মৃতি। গিলের ছোট ভাই যে তামসীর চাকরীর ব্যবস্থা করে দেবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

'তুই ইদানীংকালে গিলের ভাইকে দেখেছিস?' বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করল।

'না, কয়েক বছর দেখি না।'

'ভারী সুন্দর ছেলেটা। স্বভাব-চরিত্রের কোনো তুলনা হয় না।'

'আগে যখন দেখেছিলাম তখনই ওকে আমার দারুণ লেগেছিল।'

'এখন আরো সোবার, আরো কোয়ায়েট হয়েছে।'

'গিলের চাইতে ও আরো বেশী মার কাছে থেকেছে বলেই আরো ভাল হয়েছে।'

বিশ্বাস চলে আসার পরেও গিল বেশ কিছুদিন হাকিমপেটে ছিল। তামসীর সঙ্গে দেখা হতো, কথাবার্তা বলত। সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধার কথা।

'জান ভাইসাব, এখানে একলা থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

'কেন? বিশ্বাস নেই বলে খুব লোনলি লাগছে?

'না, না, সে কথা বলছি না।'

'তবে?' গিল চিন্তিত হয়।

'আজে-বাজে লোক বড় জ্বালাতন করে।' মুখ নিচু করে একটু চাপা গলায় তামসী বললো।

গিল আরো চিন্তিত হয়। ও তো জানে, চেনে হাকিমপেটের মানুষগুলোকে, লালাগুড়া রেল কলোনীর পরিবেশকে। তামসীও চুপ করে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় আপন মনে বলে, 'এখানে আমার মত মেয়ের একলা থাকলে যখন তখন বিপদ-টিপদ ঘটতে পারে।'

'কেন ?' গিল সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, 'কি করতে চাও ? এক্ষুনি বিয়ে করতে চাও ?'

'না, না, ভাইসাব, এক্ষুনি বিয়ে করতে চাই না। নিজেকে আরো একটু তৈরী করে নিই··· '

'তাহলে ?'

'অন্য কোথাও চলে যেতে পারলে বেঁচে যেতাম।'

দশ-পনের দিন পরে এক রবিবার সকালে গিল তামসীর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়েই বললো, সিস্টার, উড ইউ পুস অফ্ টু বম্বে ?

'বোম্বে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন ?'

'তোমার চাকরী ঠিক হয়েছে।'

তামসী যেন ঠিক খুশী হতে পারল না। গিল ভেবেছিল খবর শুনে তামসী আনন্দে লাফিয়ে উঠবে কিন্তু ওকে চিন্তিতা হতে দেখে ও নিজেও একটু অবাক হলো। 'খবরটা শুনে যেন তুমি ঠিক খুশী হলে না।'

'তুমি কি মনে কর বোম্বে ইজ সেফ ফর এ লোনলি ইয়ং গার্ল লাইক মী ?'

এবার গিল না হেসে পারে না। 'তুমি কি মনে কর তোমার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নেই ?'

তামসী গিলের হাত দুটো ধরে বললো, 'ভাইসাব, আমি কখনও তাই বলেছি ?'

'তবে তুমি ভাবছ কেন ? সব বিষয়ে চিন্তা না করলে আমি তোমাকে বোম্বে পাঠিয়ে বিশ্বাসের কাছে পিটুনি খাব ?'

তামসী আর কোন প্রশ্ন করেনি। প্রয়োজন অনুভব করেনি। এয়ার ফোর্সের চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছে। নতুন চাকরী আর নতুন জীবন শুরু করেছে বোম্বেতে। গিলের মা আর ছোট ভাইয়ের ছোট্ট সংসারে এমন সমাদরে স্থান পাবে কল্পনা করতে পারেনি সে। এই পৃথিবীর মানুষের যে এত গুণ, এত উদারতা থাকতে পারে, তা লালাগুড়ায় থাকতে জানতে পারেনি। ভাবতে পারেনি। জীবন সংগ্রামের জন্য যে চিরকাল অন্ধকার অলি-গলিতে বিচরণ করেছে সে প্রভাতী সূর্যের আলোয় রাঙা রাজপথের ঠিকানা জানবে কেমন করে ?

গিলের মত ওর ভাই অত চুপচাপ থাকতে পারে না। গুরুবচন যত লেখাপড়াই শিখুক আর যত বয়সই হোক, বাড়িতে সে এখনও ছোট ছেলে। আদুরে ছেলে। সংসারের কোন কাজকর্ম করতে পারে না, করে না। আগেও করত না, এখনও করে না। তামসী আসায় ওর মজা আরো বেড়েছে। বাইরের যাবতীয় কাজ আজকাল তামসীই করে। স্বেচ্ছায়। খুশী হয়ে করে কিন্তু মাতাজী পছন্দ করেন না ঠিক মেনে নিতে পারেন না। প্রায়ই ছেলেকে বলেন, 'আচ্ছা তোর কি চোখ নেই?'

গুরুবচন অবাক হয়, 'থাকবে না কেন?'

'এই মেয়েটা দশটা-পাঁচটা অফিস করে বাজার-হাট করে, তুই কি দেখতে পাস না?'

গুরুবচন হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, 'তাতে কি হলো?'

মা রেগে যান, 'তাতে কি হলো? বাড়ির ছেলেরা বসে থাকবে আর মেয়েটা খেটে খেটে মরবে?'

'খাটুক, খাটুক। না খাটলে মোটা হয়ে যাবে আর মোটা হলে ঐ কালো বেঁটে মেয়েকে বিশ্বাসদাও বিয়ে করবে না।' প্রায় দার্শনিকের মত ও মন্তব্য করে।

মা এবার সত্যি সত্যি রেগে যান, 'আঃ। কি আজে বাজে কথা বলছিস? বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে সম্মান করতেও শিখলি না?'

বাথরুম থেকে বেরিয়েই মার গলা শুনে চমকে ওঠে তামসী। তাড়াতাড়ি ছুটে আসে ড্রইং রুমে। 'কি হলো মা?'

মা কিছু বলার আগেই গুরুবচন বললো, 'আমি তোমাকে কালো বলেছি বলে মা রেগে গেছেন।'

তামসী সঙ্গে সঙ্গে ওর পিঠে একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়ে বললো, 'আর কালো বলবে?'

'সারা জীবন, চিরকাল, যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন বলব।'

তামসী হাসে। হাসতে হাসতেই বললো, 'দেখছেন মা, কি অসভ্য। মার খেয়েও লজ্জা নেই।'

গুরুবচন না থাকলে মাঝে মাঝে ওদের নানা কথা হয়। কখনও গুরুবচনকে নিয়ে, কখনও অন্য কোন বিষয়ে।

তামসীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মাতাজী বলেন, 'ছেলেটা তোমাকে বড্ড বিরক্ত করে, তাই না মা?'

'না, না, এতে বিরক্ত হবার কি আছে?'

'ও কিন্তু নেহাতই ঠাট্টা করে। তুমি কিছু মনে করো না।'

'আপনি ওসব নিয়ে কিছু ভাববেন না।' তামসী হঠাৎ যেন একবার ডুব দেয় নিজের মধ্যে। কিছুক্ষণ কথা বলে না, বলতে পারে না। তারপর প্রায়

আপন মনে বলে, 'ওর মত সত্যি সত্যিই যদি আমার একটা ভাই থাকত তাহলে আমার দুঃখ কি ছিল ?'

তামসী একটু থামে। তারপর আবার শুরু করে, 'জানেন মা, যে পরিবেশে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, সেখানে অসংখ্য হিংস্র লোভী, কামাতুর পুরুষ আছে কিন্তু ভাই ? প্রায় কল্পনাতীত। বিশ্বাস আমার জীবনের প্রথম ব্যতিক্রম। তাইতো ওকে আমি হারাতে চাইনি। চাই না।'

মাতাজী ওকে সান্ত্বনা দেন, 'আর দুঃখ করো না মা। যা দুঃখ তুমি পেয়েছ, তাইতো তোমাকে আর দুঃখভোগ করতে হবে না।'

তামসী শুনল। হাসল। 'সরকারদা আর আপনার দুই ছেলে ছাড়া আর কেউ আমাকে এমন মর্যাদা দেয়নি। গুরুবচন যত বিরক্ত করে আমার তত ভাল লাগে।'

কোন রকমে দুদিন ছুটি পেলেই বিশ্বাস তপনকে নিয়ে ছুটে গিয়েছে বোম্বে। সিনেমা দেখত না, জুহুর সমুদ্র পাড়ে বেড়াতে যেত না মেরিন ড্রাইভের ধারেও যেত না। বাড়ির মধ্যেই কাটিয়ে দিত। এক মিনিটের জন্যও কেউই বাইরে বেরুতে চাইত না। কথা আর কথা। শুধু কথা। কাহিনী গল্প। মাঝে মাঝে গুরুবচনের টিপ্পনী। 'জানেন বিশ্বাসদা, তামসী কেন আপনাকে এত খাতির যত্ন করে ?'

'কেন ?'

'এমন কালো ভূতের মত মেয়েকে, পৃথিবীতে আর কোন ছেলে পছন্দ করবে ?'

তপনকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে তামসী উঠে গিয়ে গুরুবচনের পিঠে দুম্ করে কিল মেরে বললো, 'আমাকে দেখতে কালো আর তুমি কি ?'

বিশ্বাস তামসীকে না বকে পারল না। 'কি আশ্চর্য ওকে এমন করে মারে ?

মাতাজী হাসতে হাসতে বললেন, 'দু' একবার মারামারি না করে ওরা থাকতে পারে না।'

'কিন্তু····· '

বিশ্বাস ঠিক মেনে নিতে পারে না।

মাতাজী হাসতে হাসতে বললেন, আগে আগে আমি নিজেই ঘাবড়ে যেতাম কিন্তু এখন মাঝে মাঝে ওদের চেঁচামিচি না শুনলে যেন বাড়ীটা প্রাণহীন মনে হয়।'

তপন মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখে—তামসীকে।

'কি দাদা অমন করে কি দেখছেন ?' তামসীই জিজ্ঞাসা করল।

'তোমাকে দেখছি।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ তোমাকে।'

'কেন আমাকে কি দেখছেন ?'

তপন একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, 'দেখছি ভগবানের হিসেবে ভুল নেই। এতদিন যা দিতে পারেন নি, কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব করে এবার তা শোধ করছেন। এখনও তোমার ঝুলি ভর্তি হবার পালা, আর কোনদিন শূন্য হবে না।'

মাতাজী তামসীকে কাছে টেনে নিয়ে বিশ্বাসকে বললেন, 'তপন ঠিকই বলেছ বাবা। এমন সুন্দর মেয়ে তুমি পাচ্ছ যে তার কোন তুলনা হয় না।'

গুরুবচন হঠাৎ বলে উঠল, 'সত্যিই তো! ওর ভাগ্য ভাল না হলে আমার মত দাদা পায় ?'

ওর কথায় সবাই না হেসে পারল না। তামসীও হাসল। হাসতে হাসতেই বললো, 'আবার উঠব ?'

হাসি থামলে তপন বললো, 'তামসীর ভাগ্য ভাল না হলে আপনাকে পায় ?

স্নেহাতুরা বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ও কথা বলো না বাবা। তোমাদের মত ছেলে আর তামসীর মত মেয়ে পেয়ে আমিই সব চাইতে বেশী লাভ করেছি।'

মাতাজী একটু থামলেন। একবার সবাইকে দেখলেন। 'আগে আগে ভীষণ ভয় করত, দুশ্চিন্তা হতো। দুটো ছেলেকে নিয়ে থাকতে সবসময় নানা রকম চিন্তা হতো কিন্তু এখন তোমাদের পেয়ে আমার আর কোন ভয়, কোন দুশ্চিন্তা নেই।

পুণা এয়ার ফোর্স মেসের ডান দিকের কোণার ঘরে শুয়ে শুয়ে তপন অবাক হয়ে ভাবে। ভাবে গিল ফ্যামিলির কথা, তামসীর কথা, বিশ্বাসের কথা। ওর নিজের কথা। কৃষ্ণা-গোদাবরী, শতদ্রু-বিপাশা আর গঙ্গাতীরের মানুষগুলো কী ভাবে এক হলো! বাঙালী, পাঞ্জাবী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ওদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, পোষাক আলাদা, খাবার আলাদা। অথচ কি এক বিচিত্র অনুভূতির বন্ধনে ওরা সবাই জড়িয়ে পড়েছে। ভাবতে পারে না, বুঝতে পারে না ওদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব, কোন সংঘর্ষ, কোন বিভেদ আছে।

এমন হয়। এয়ার ফোর্সের মানুষগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা আত্মীয়তার সূত্র লুকিয়ে থাকে। দিগন্ত বিহীন আকাশের কোলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ছোট-খাট সামাজিক পার্থক্য ওদের কাছে ধরা পড়ে না। মাটির পৃথিবীর মানুষের কাছে যা বিরাট, যার গুরুত্ব অনেক, আকাশের কোলে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের কাছে সব সমান, সব এক। সব একাকার।

বাড়ির মানুষগুলেও কেমন পাল্টে যায়। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে যারা নিত্য সঙ্গী, যাদের বন্ধুত্ব আর ভ্রাতৃত্বের সীমারেখা দূরের মানুষের নজরে পড়ে না, তাদের বাড়ির সবাই ত পাল্টে যায়। রং বদলায়। এই পৃথিবী যে একটা রঙ্গশালা, তা সাধারণ মানুষের কাছে তত্ত্ব মাত্র কিন্তু এদের জীবনে তা

জীবন্ত সত্য। নিত্য তার প্রমাণ পাচ্ছে এরা। এই রঙ্গশালার পরের দৃশ্য সত্যিই অজ্ঞাত। জীবন মহাসমুদ্রে কখন আর একটি বুদবুদ ফেটে যাবে, কেউ তা জানে না। এরাও জানে না কিন্তু এদের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়।

তপন কত কি ভাবে। প্রথম যখন বাবা-মাকে ছেড়ে ডেরাডুন গিয়েছিল, তখন স্বপ্ন দেখত নিজেকে নিয়ে। শুধু নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে মশগুল থাকত। আস্তে আস্তে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। এখন যেন শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবতেও ঘেন্না করে। প্রবৃত্তি হয় না। রুচিতে বাধে। মন স্বীকৃতি দেয় না। সীতা কাছে নেই। তবু নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করে না। তবে মনে মনে কল্পনা করে গুরুবচনের ফ্ল্যাটে সীতাও এসেছে। তামসীর সঙ্গে কানে কানে ফিস ফিস করে কথা বলছে আর মাঝে মাঝে সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে দেখছে। না, না, শুধু দেখছে না। কি যেন ইসারা করছে, কি যেন বলছে!

'জান সীতা, একদিন স্বপ্ন দেখতাম, মনে মনে ভাবতাম তোমাকে আর আমাকে নিয়ে একটা ছোট্ট দুনিয়া সৃষ্টি হবে। এই পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে বাস করেও আমরা হারিয়ে যাব না, নিঃশেষ হব না। কিন্তু এখন মনে হয় অমন বন্দী জীবন আমরা যাপন করব না। অত স্বার্থপর আমরা হতে পারব না। আমাদের সংসারের, সব দরজা জানলা খোলা থাকবে। মাতাজী, গিল, গুরুবচন, তামসী, বিশ্বাস ও আরো আরো অনেকের স্পর্শে তোমার সংসার মন্দিরের মত পবিত্র হয়ে উঠবে। পদ্ম পাতার জলের মত আমাদের জীবনের স্থায়িত্ব কতটুকুই বা? যতদিন এই পৃথিবীতে থাকব, ততদিন এদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখব কেন? পরম শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালবাসার পলিমাটি দিয়েই তো আমাদের জীবন সংসার আরো শ্যামল পবিত্র হয়ে উঠবে তাই না?'

চিঠিটা লিখেই তপন নিজেই অবাক হয়, বিস্মিত হয় নিজের মনের বিবর্তনে। কিন্তু এমন হয়। সম্ভব হয়। পরিপূর্ণভাবে একজনকে পেলে বহুর মধ্যে ব্যাপ্তিতে ভয় কি? যাকে সুখে দেখা যায়, দুঃখে পাওয়া যায়, যাকে হারিয়েও গোপনে দেখা যায়, সে অনন্যার দু'চোখ দিয়ে সারা-বিশ্ব দেখা যায়। "চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে।'

একটা চারা থেকেই বনানী। একটা জীবন থেকেই অসংখ্য জীবন। একটা পাওয়া থেকেই অনেক পাওয়া। এক সুখ থেকেই অনন্ত সুখ সীমাহীন পরিতৃপ্তি।

এইভাবেই জীবন এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলে তপন, সীতা।

॥ আট ॥

রঙে রসে ভরপুর হয়ে পুণার দিনগুলো বেশ কেটে গেল। ভ্যাম্পায়ার আর সীতা—দুটোই এখন তপনের বড় আপন, বড় প্রিয়। দুটিকে নিয়েই দূরে থেকে অদূরে, সীমা থেকে অসীমে বিচরণ করা যায়। করে। ওরাই ওর মুক্তি। দৈন্য থেকে মুক্তি, অতৃপ্তি থেকে মুক্তি, ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি। অতীত থেকে মুক্তি, নতুন দিনের ইঙ্গিত, আমন্ত্রণ।

একজামিনেশন 'বি' যদি একেবারে পাশ করতে পারত, তাহলে আরো ভাল হতো। প্রফেশন্যাল, জেনারেল নলেজ আর এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পাশ করল কিন্তু ফেল করল এয়ারফোর্স ল'তে। ছ'মাস পরে আবার পরীক্ষা দিয়ে এয়ারফোর্স ল'তেও পাশ করল বটে কিন্তু সীতা রেগে গিয়েছিল, দুঃখ পেয়েছিল। 'আমি তোমার জীবনে আসার পর কেন এমন হলো? আমাকে নিয়ে কি তুমি জীবনের অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না? আমি কি তোমাকে তোমার জীবনের সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিতে পারব না? ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে মনে অদ্ভুত অস্বস্তিবোধ করছি। ভাবছি হয়ত কোন অন্যায় করছি। নাকি কোন ভুল হয়ে গেল।'……

সীতা এত সিরিয়াস? এত ভাবে? এত চিন্তা করে? তপন বিস্মিত হয়। তবে ভাল লাগে। ভীষণ ভাল লাগে। 'এয়ারফোর্স ল'তে ফেল করা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং উচিত। গান্ধীজি আইনভঙ্গ আন্দোলন করে প্রাতঃস্মরণীয় হলেন কিন্তু আমি যখন সামান্য আইন ভঙ্গ করতে গিয়েছি তখনই তুমি বাধা দিয়েছ, আপত্তি করেছ, আমাকে নিবৃত্ত করেছ। আইন-ভঙ্গ না করলে কি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে?'

সীতা উত্তর দেয়, 'তোমাকে দেখে যত সহজ, সরল, ভদ্র মনে হয় আসলে তুমি তা না। এবার কলকাতা এলে তোমাকে মজা দেখাব। আইন ভঙ্গ তো দূরের কথা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনও করতে পারবে না। বেশীদিন গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে দিলে যে আইন-ভঙ্গ করার প্রবৃত্তি জাগে, তা আমি জানি।'

চিঠিটা পড়ে দারুণ মজা লাগে তপনের। চিঠি নয়ত যেন পাশে বসে শাসন করছে। 'তোমার চিঠি পেয়ে চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া না করানই ভাল। তোমাকে এম.এ পড়তে না দিয়ে এতদিনে তোমাকে মেটারনিটি ওয়ার্ডে ভর্তি করার ব্যবস্থা করলেই ভাল হতো। যাই হোক অবিলম্বে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়া ছেড়ে দাও। বিহারীলাল কলেজে হোম সায়েন্স পড়া শুরু করো। আর যদি 'প্রাইভেট'-এ পড়তে চাও তাহলে এক্ষুনি আমার কাছে চলে এসো।'

পুণা আর কলকাতা। দেখা হতো না কিন্তু তবুও দেখতে পেতো। কথা

না বলেও বলা হতো। শুনতে পেতো। ওরা যেন আরো নিবিড় হলো। দূরে থেকেও কাছে এলো। বিচিত্র! সত্যি বিচিত্র। মেঘের আড়ালে সূর্য লুকিয়ে থাকলেও সারা পৃথিবীতে তার আলো ছড়িয়ে পড়ে, অন্ধকার বিদায় নেয়।

ছুটির আগেই অর্ডার পেল ছুটির শেষে পাইলট এ্যাটাক্ ইনসট্রাক্টার কোর্সের জন্য জামনগর যেতে হবে। ছ'মাসের কোর্স। তারপর আবার পুরানো স্কোয়াড্রনে ফিরে আসতে হবে। এত তাড়াতাড়ি এই কোর্স করতে পারবে, তপন ভাবেনি। আশা করেনি। খবরটা শুনে ভাল লাগল। আরো ভাল লাগল যখন শান্তাবৌদির চিঠিতে জানতে পারল ও'রাও এবার জামনগর আসছেন। তাহলে হয়ত সীতা আবার বেড়াতে আসবে। এবার তো আর আগের মত দ্বিধা, জড়তা বা সংকোচ থাকবে না। প্রাণ খুলে কথা বলবে, বেড়াবে। কখনও কাছে, কখনও দূরে।

'আচ্ছা শান্তাবৌদি তোমাদের জামনগরে আসা কি উচিত হবে? তুমি উইং কমান্ডারের স্ত্রী হলেও আমার মত অতি সাধারণ ফ্লাইং অফিসারকেও তোমায় খাতির যত্ন করতে হবে! ভাল-মন্দ রান্না করে স্বামীকে না খাওয়ালেও আমাকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে টুকটাক প্রেজেনটেশনও দিতে হবে। আরো কত কি! তার চাইতেও বড় কথা—তোমরা জামনগরে থাকলেই সীতা আসবে। আসবেই। ও আসতে না চাইলেও তুমি যেভাবে হোক টেনে আনবে। আর সীতাকে দেখলেই হয়ত রামের মত ধৈর্য না দেখিয়ে রাবণের মত অধৈর্য হয়ে উঠতে পারি এসব ভেবে দেখেছ কি?'

কলকাতায় পৌঁছবার দু'তিন দিন পর সীতা হঠাৎ একদিন রাত্রিতে ফোন করল, 'তুমি কি দিদিকে কোন চিঠি দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। হঠাৎ তার কি দরকার হলো?'

'এক্ষুনি বাড়ী এসে দেখছি দিদির একটা চিঠি এসেছে।'

'তাতে কি হলো?'

'তুমি নিশ্চয়ই আজে বাজে কিছু লিখেছিলে?'

'কি করে বুঝলে?'

'সম্ভব হলে এক্ষুনি তোমাকে চিঠিটা দেখাতাম।'

'তুমি এখন আসবে?'

'বড় বেশী সাহস বেড়ে গেছে, তাই না?'

'আমি আসব?'

'নিশ্চয়ই। এক্ষুনি চলে এসো। আমি তোমার জন্য মালা হাতে করে বসে আছি।'

'সে কি? কিন্তু আমি এখন টোপর পাব কোথায়?'

পরের দিন তপন চিঠিটা দেখেছিল। ভারী মজা লেগেছিল। ভাল লেগেছিল সীতারও, কিন্তু—

'এই চিঠি যদি মা দেখতেন ?'

প্রশ্ন শুনে তপন হাসে, 'তোমার চিঠি মা দেখবেন কেন ?'

'ভুল করেও তো খুলতে পারতেন ! তাহলে আমি মুখ দেখাতাম কি করে ?'

দু'হাত দিয়ে সীতার মুখখানা তুলে ধরে ও প্রশ্ন করে, 'এই চিঠি দেখলেই যদি মুখ দেখাতে না পার তাহলে বিয়ের পর, ইয়ের পর মুখ দেখাবে কেমন করে ?'

সীতা দৃষ্টিটা নামিয়ে বলে, 'জানি না।'

'সুন্দরী, জানি না বলেল তো চলবে না।'

মা অনেক কিছু না দেখলেও বহু কিছু বুঝতে পারেন। অনুমান করতে পারেন আরো বেশী। ক'দিন আগেই উনি তপনের মাকে বলেছেন, দিদি, বেশ বুঝতে পারছি ওরা বেশ জড়িয়ে পড়েছে। আর বেশী দেরী করা বোধহয় ঠিক হবে না।'

সরকার গিন্নীর বেশ মজা লাগে। জানতে চান, 'কেন কি হলো ?'

'সীতার টেবিলে বা ড্রয়ারে তো হাত দেবার উপায় নেই। তোমার ছেলের ছবি আর চিঠিতে ভর্তি।'

'তাই নাকি ?'

'তবে কি ?' একটু হেসে একবার চারপাশ দেখে নেন কেউ কিছু শুনছে কি না। 'মেয়ে শোবার সময় আবার তোমার ছেলের ছবি না নিয়ে শু'তে পারেন না...'

'তুমি জানলে কেমন করে ?'

'আমি তো দূরের কথা, চাকরটা পর্যন্ত জেনে গেছে।'

'সে কি গো !'

'তবে আর বলছি কি !'

'কি করে জানলে ?'

'ছবি নিয়ে শুতে গেলে কি হয়, সকাল বেলায় তুলে রাখতে তো প্রায়ই ভুলে যায়।'

দুই গিন্নীর মুখেই হাসি যেন ধরে না।

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? হয় চাকরটা না হয় আমি তুলে রাখি।'

গতবার তপন যাবার পর প্রথম কয়েকটা দিন সীতা দারুণ অস্বস্তির মধ্যে কাটাল। এমন একটা বিচিত্র শূন্যতা জীবনে কোনদিন সে অনুভব করেনি। লেখাপড়া-কাজকর্ম, মা-বাবা-মিতুলকে নিয়ে কোনমতে দিনটা কাটে, সন্ধ্যাবেলাও হামাগুড়ি দিতে দিতে পার হয় কিন্তু যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে ছুটি পায়, যখন আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি এসে দৃষ্টিটা অবরোধ করে না, তখন শূন্যতার জ্বালা তীব্র থেকে তীব্রতর, তীব্রতম হয়। একবার

বসে, একবার পায়চারী করে। একবার জানলার ধারে দাঁড়ায়, একবার বারান্দায় গিয়ে প্রায় নির্জন ল্যান্সডাউন রোডের দিকে তাকিয়ে থাকে। মৃগনাভী হরিণীর মত ক'দিন ছট্‌ফট্‌ করার পর হঠাৎ একদিন রাত্রে ড্রয়ার থেকে তপনের ছবিটা বের করে অনেকক্ষণ দেখল। দু' চোখ দিয়ে, সমস্ত দৃষ্টিশক্তি দিয়ে দেখল। সমস্ত অন্তর দিয়ে দেখল। সান্নিধ্য উপলব্ধি করল। ভালবাসার উষ্ণতা অনুভব করল। ফটোটাকেই আদর করল, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করল। তারপর ঐ ফটোটা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

সেদিন থেকে রোজ, নিত্য। কিছুদিন তপনকেও জানায়নি। জানাতে পারেনি। লজ্জা করেছে। তারপর জানিয়েছে। না জানিয়ে পারেনি। 'অনেক দিন ধরেই তোমাকে একটা কথা লিখব লিখব ভাবছি কিন্তু এতদিন লিখতে পারিনি। নানা কারণে। কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা সঙ্কোচ। তাছাড়া নিজেকে একটু ভাল করে পরীক্ষা করছিলাম। নিরীক্ষাও করছিলাম। অনেক দিন, অনেক রাত্রি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছি, উত্তর দিয়েছি। ভেবেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সারা রাত্রি ধরে। সব শেষে বুঝেছি তুমি আমার জীবনের মোহ না, মোহময় মোহনা। কুয়াশায় তুমি আমার দৃষ্টি ঝাপসা করে দাওনি। তুমি শুধু আমার যৌবনের কামনা নও, তুমি আমার সারা জীবনের সাধনা! তুমি আমার জীবন-সত্তা। জীবন-প্রকৃতি।...'

থামতে পারেনি সীতা। থামতে চায়নি। স্বীকারোক্তি না করে শান্তি পায়নি। 'বিশ্ব প্রকৃতির খেলাঘরে কত রং, কত খেলা। অথচ প্রকৃতি তো এক। সেই আকাশ, সেই অরণ্য-পর্বত, সেই নদী-নালা-সমুদ্র, বাতাস! তবু তারা রং বদলায়। সকাল-সন্ধ্যায়, ঋতুতে-ঋতুতে। দেশে-দেশান্তরে। কেন ভগবান? কত অসংখ্য বিচিত্র তার রূপ! অথচ ভগবান তো এক। অভিন্ন। তুমি আমার সেই অসীম উদার প্রকৃতি। আমার জীবন দেবতা। প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে তোমাকে উপলব্ধি করি। তোমাকে অনুভব করি। রাত্রিতে, যখন সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে, অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যায়, তখন আমি তোমার ছবিটা নিয়ে তোমার সান্নিধ্য লাভ করি। অর্ধেক আমি ঘুমিয়ে পড়ি, অর্ধেক আমি জেগে থাকি। আমার দেহটা তখন মারা যায় কিন্তু মনটা? সে তোমার যাদুস্পর্শে বসন্তোৎসবে মেতে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যেও দীপান্বিতার আলোয় ঝলমল করে ওঠে আমার মন, 'আমার সমস্ত অন্তরসত্তা!.....'

সব শেষে দাবী জানিয়েছিল. 'ছবি চাই। তোমার অনেক ছবি চাই। চিঠি চাই, ফটো চাই; ফটো চাই, চিঠি চাই। চিঠির সঙ্গে ফটো চাই ফটোর সঙ্গে চিঠি চাই!'

সব শুনে সরস্বারাগিনী সীতার মাকে বলেছিলেন, 'কিন্তু ভাই ও তো এক্ষুণি বিয়ে করতে চাইছে না।'

'ও কি বলছে?'

'বলছে ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট না হয়ে বিয়ে করবে না।'

'তাহলে তো আরো বছর খানেক দেরী, তাই না দিদি?'

'ঠিক জানি না। তবে বোধহয় খুব বেশী দেরী নেই। তাছাড়া বাবুল চায় সীতা এম এ'টা পাশ করে নিক।'

বিয়ে নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যেও কথা হয়। না বলে পারে না। 'জান সীতা, মা তো আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছেন।'

'কেন?'

'কেন আবার! বিয়ে করার জন্য।'

'তাই নাকি?'

'তবে কি? রোজই এক কথা, কবে তুই বিয়ে করবি, এত দেরী করার কোন অর্থ হয় না, আরো কত কি।'

'তুমি কিছু বলেল না?'

'একবার না, হাজারবার বলেছি আমার প্রমোশন হোক, তোমার পরীক্ষা হয়ে যাক, তারপর সব কিছু হবে।' তপন সীতাকে দেখতে দেখতে হাসে। মিট মিট করে হাসে।

'অমন করে হাসছ কেন?'

'তোমার সঙ্গে আরো কিছুদিন পরে আলাপ হলে ঠিক হতো।'

'তার মানে?'

'আমার মত জুনিয়ার অফিসারের স্ত্রী হলে তোমাকে ঠিক মানাবে না.....'

একটু অভিমানের সুরে সীতা জবাব দেয়, 'ঠিক আছে। এখন বিয়ে করো না। পাঁচ-দশ বছর পরে ভেবে দেখো, এত ব্যস্ত কি?'

'এত দিন ধৈর্য ধরতে পারবে?' তপন ওর কানে কানে বলে।

'খুব পারব। তোমাদের মত আমরা এত সহজে অধৈর্য হই না।'

'এতকাল ফটো আদর করেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে?'

'তুমি নিজে ঠিক থাকতে পারবে?'

'অসম্ভব, কিছুতেই না।'

দুজনে এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

অনেক সহজ সরল হয়েছে ওরা দুজনে। রাস্তা পার হবার সময় হঠাৎ একটা গাড়ি এসে পড়লে তপন ঝট করে সীতাকে টেনে নেয়। লাইট হাউসের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবার সময় কোমরে একটু হাত দিতে আর লজ্জা করে না। লজ্জা করে না হাসি-ঠাট্টা করতে, কিছু দিতে কিছু নিতে। কিছু বলতে, কিছু শুনতেও লজ্জা করে না আজকাল।

লাইট হাউস থেকে বেরিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটে ঢুকতেই সীতা ডাকল, শুনছ?'

মুখ নিচু করে তপন বললো, 'কি বলছ?'

'আমাকে একটা জিনিস দেবে?'

'কি চাই ?'

'একটা ব্লাউজ কিনতে হবে।'

তপন অবাক হয়, ব্লাউজ!

'হ্যাঁ। তোমার ঐ চেক দেওয়া কাঞ্জিভরম্ শাড়ীর সঙ্গে পরার মত আমার কোন ব্লাউজ নেই..... '

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু'......তপন যেন কেমন অদ্ভুতভাবে দেখে।

'কিন্তু কি ?' সীতাও অবাক হয়।

তপন বেশ গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমি চাই না তুমি ব্লাউজ পর, তাই ব্লাউজ-পিস দিইনি..... '

সীতা হেসে বলে 'আমি বরং সুইমিং কস্টিউম পরে ঘুরে বেড়াব, কি বল ?'

ঐ রাস্তার মাঝখানেই সীতার হাতটা জড়িয়ে তপন প্রায় চীৎকার করে, উঠল, 'লাভলি! দ্যাটস্ হোয়াট আই ওয়াণ্ট!'

'তা তো বটেই' বলেই সীতা হাতটা সরিয়ে নেয়।

হাসি-ঠাট্টা রসিকতা করলেও নানা সময় নানা কথা ওরা আলোচনা করে তর্ক করে, সিদ্ধান্তে পেঁছিতে চেষ্টা করে।

'আচ্ছা অধিকাংশ এয়ার ফোর্স অফিসারই বেশ ডেডিকেটেড হাসব্যাণ্ড হয়, তাই না ?'

সীতার প্রশ্ন শুনে তপনের হাসি পায়। 'হঠাৎ এ ধারণা তোমার হলো কেমন করে ?'

'জামাইবাবুকে দেখলাম। ওর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকেও দেখেছি। সবাই স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন। সংসারকে সুখী করার জন্য সবাইকে বেশ উৎসাহী মনে হয়।' সীতা এক মুহূর্তের জন্য থামে, একটু ভাবে। 'তাছাড়া......

'তাছাড়া কি ?'

'তাছাড়া তোমাকেও তো দেখছি।'

তপন হাসে! অনেকের অনেক কথাই বলতে পারে। বলে না। বলার প্রয়োজন, তাগিদ অনুভব করে না। তাছাড়া ঠিক উচিত মনে হয় না। 'কিছুদিন পরে তুমি নিজেই তো কত অফিসারকে দেখবে, মিশবে। তখন নিজেই বুঝতে পারবে।'

'তবুও......'

'যারা সুখী হয় তারা সত্যি সুখী হয় কিন্তু যারা সুখী হয় না, হতে পারে না, তাদের মত দুঃখী আর কোথাও পাবে না।' কথাগুলো বলতে বলতে তপনের চোখের সামনে কতকগুলো মানুষের ছবি ফুটে ওঠে। কেউ হাসছে,

খেলছে, ঠাট্টা করছে, গান গাইছে নাচছে, মদ খাচ্ছে। আবার কেউ স্কোয়াড্রন লীডার সলিল ঘোষের মত……

প্রথম কিছুদিন আলাপের পর তপন বলেছিল, 'দাদা' এত মদ খান কেন?'

হুইস্কীর গেলাসটা মুখে তুলতে গিয়েও স্কোয়াড্রন লীডার ঘোষ নামিয়ে রাখলেন। একটু হাসলেন। শুকনো হাসি। প্রাণহীন হাসি, ব্যর্থতার হাসি। দুঃখের হাসি। 'দেখ তপন জীবনে না পাবার দুঃখ সহ্য করা যায় কিন্তু বঞ্চনা! অসম্ভব। এর চাইতে বড় দুঃখ আর ব্যর্থতা মানুষের জীবনে আর কিছু নেই।'

'তবু …

'না, না, তপন এর মধ্যে কোন ইফস্ এ্যান্ড বাটস্ নেই। এই পৃথিবীতে সব মানুষ ভালবাসতে পারে না, ভালবাসা পায় না। তারা দুঃখী। দে আর আনফরচুনেট বাট যারা আমার মত? যারা পেয়েও কিছু পেল না? তারা? স্কোয়াড্রন লীডার ঘোষ ঠোঁট দুটো বাঁকা করে কেমন একটু অদ্ভুত হেসে হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিলেন।

শকুন্তলা বৌদির ছবিটাও তপনের চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই জীবন, এই পৃথিবী—সব কিছুই যেন ওর কাছে বিদ্রুপ মাত্র।

না, না, থাক। ওদের কথা আর ভাবে না তপন। মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। অনেক মানুষের অনেক স্মৃতির ভীড় ঠেলে শকুন্তলাবৌদি সামনে এসে দাঁড়ান।

'জান ভাই, এই পৃথিবীতে সবাই চুরি করে। সবাই। আই সে অল। কেউ ছোটখাট চুরি করে, কেউ বড় চুরি করে। ধরা না পড়লে সবাই সাধু……'

তপন চুপ করে শকুন্তলাবৌদির কথা শোনে।

'মনে করো না আমি মদ খাচ্ছি বলে বাজে কথা বলছি…'

'না, না, তা মনে করব কেন?'

গেলাসের মধ্যে কয়েক টুকরো আইস কিউব ফেলে দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত। ইউ আর রিয়েলি এ গুড বয়। তোমার কাছে আই উইল নেভার টক্‌ন নন্‌সেন্স।'

'তা আমি জানি বৌদি।'

'বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। আই মীন বাবা-মা জোর করে বিয়ে দিয়েছেন। তার আগে কলেজে পড়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। কফি হাউসে আড্ডা দিয়েছি। কত কি…'

আবার এক চুমুক খেলেন।

…'কত কি করেছি। মাই গড! কি আনন্দেই কাটিয়েছি দিনগুলো! সন্দীপন চ্যাটার্জীকে রিয়েলি ভাল লাগত। আই মীন আই ওয়াজ ইন লাভ

উইথ হিম·· আই এ্যাম সরি। উই লাভড ইচ আদার। দ্যাট ওয়াজ দি টাইম টু মেক লাভ······'

'ওসব কথা বলে আর লাভ কি বৌদি ?'

ঠাস করে গেলাসটা সেণ্টার টেবিলে রেখে বললেন, দ্যাটস রাইট। ওসব কথা বলে আর লাভ নেই। ইউ আর রাইট তপন! বাট!'

শকুন্তলাবৌদি যেন শ্রাবণের মেঘের মত গর্জন করে কেঁদে উঠলেন।

'বাট! ঐ বয়সে সব মেয়েই প্রেম করে। ভালবাসে। বাট আই হ্যাড দি ক্যারেজ টু কনফেস। স্বামীর কাছে সব বলেছি। ধরা পড়ে গেছি ····'

বোতল থেকে আরো খানিকটা হুইস্কী গেলাসে ঢেলে বললেন, 'চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি। সো তপন! আই এ্যাম এ কনডেমড্ গার্ল! জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল।'

'আচ্ছা, বৌদি, সন্দীপনবাবু বিয়ে করলেন না কেন ?'

'প্রেম করলেই যদি বিয়ে করা যেতো, তাহলে আর দুঃখ কি ছিল ? গল্পের গরু গাছে চড়ে বলে গল্প-উপন্যাসে প্রেম করলেই বিয়ে হয় কিন্তু সাধারণ মিডলক্লাস বাঙালী ফ্যামিলীতে ? অসম্ভব, অবাস্তব।'

'সন্দীপনবাবু বিয়ে করেছেন ?'

'দ্যাট ইডিয়টটাও বিয়ে করেনি বলেই তো সর্বনাশ হলো। তা না হলে হয়ত স্মাগলিং বিজনেস্ ঠিকই চলতো।'

অথচ······

ওদের কথা ভাবতে ভাবতে তপন যেন তলিয়ে যায়। সীতা আস্তে ওর হাতে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কি এত ভাবছ ?'

'ভাবছিলাম স্কোয়াড্রন লীডার সলিল ঘোষ আর শকুন্তলাবৌদির কথা ?'

'কেন কি হয়েছে ওদের ?'

বড় আনফরচুনেট লাইফ ওদের। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কেউ কাউকে ভালবাসে না। দুজনেই মদ খেয়ে দুঃখকে ভুলবার চেষ্টা করেন অথচ·· ··

'অথচ কি ?'

'সলিলদা রাত্রি ন'টা—সাড়ে ন'টার পর মদ খেলেই বৌদি দারুণ রেগে যান——'

'কেন ?'

'কেন আবার ? বলেন, পরের দিন ভোরে উঠেই ফ্লাই করতে হবে না ? বেশী মদ খেলে হ্যাংগ ওভার থাকবেই এবং তাহলে কি হবে কিছু বলা যায় না।'

'উনি মদ খাওয়া বন্ধ করেন ?'

'হ্যাঁ। তবে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ভয় নেই শকুন্তলা, এয়ার ক্রাশে আমি মরব না। তোমার একটা ছেলে থাকলে হয়ত সত্যি সত্যিই এয়ার ক্রাশে মরতাম

কিন্তু এখন মরলে তোমাকে কে দেখবে ? আমি ছাড়া কে তোমাকে দেখবে বলতে পার শকুন্তলা ?'

সীতা প্রায় মুগ্ধ হয়ে শোনে।

'জান সীতা ওদের কোনো পার্সোনাল রিলেশান নেই। দে জাস্ট লিভ টুগেদার। বাট সলিলদা রোজ সকালে ফ্লাই করতে যাবার আগে শকুন্তলাবৌদি ওকে একটা কিস্ দিয়ে বলেন গুড লাক।

'বাঃ। বিউটিফুল!' সীতার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসে।

'রিয়েলি বিউটিফুল। সলিলদা কি বলে জান?'

'কি বলেন?'

'রোজ ভোরবেলায় ফ্লাইং-এ যাবার আগে ওর একটা কিস্ পাবার জন্যই বোধহয় আমি বেঁচে আছি।'

সীতা একটু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'দেখ তপন, আমি বলছি ওরা সুখী হবেই। না হয়ে কিছুতেই পারে না।'

'তুমি বলছ ওরা সুখী হবে?

'আমি বলছি ওরা সুখী হবেই!

সীতার কথা শুনে তপনের মনটা খুশীতে ভরে যায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'নিশ্চয়ই?'

'জবাব দেবে?'

'কেন দেব না?'

'শকুন্তলাবৌদির মত তুমিও আমাকে ফ্লাইং'এ পাঠাবার আগে কিস্ করবে?'

সীতা রেগে যায়, 'জানি না।'

তপন তবুও নাছোড়বান্দা, 'বল না দেবে কি না?'

'সে তখন ভাবা যাবে।'

'তা হবে না। এক্ষুনি বলতে হবে।'

'তোমার চাইতে অসভ্য মানুষ হয় না।,

'তাই নাকি?'

'তবে কি?'

'সে যাইহোক আমার কথার জবাব দাও।

অনেকক্ষণ ধরে তর্ক চলার পর শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে সীতা বলে, 'আচ্ছা দেব।'

তপন আনন্দে উত্তেজনায় বলে, ভেরী গুড! হ্যাভ এ ট্রায়াল রাইট নাউ!'

সীতা সঙ্গে সঙ্গে ওর পিঠে একটা ঘুষি মেরে বল্লো, 'পিঠ ফাটিয়ে দেব।'

আস্তে আস্তে ছুটির দিনগুলো ফুরিয়ে আসে। তপন আবার চলে যায়।

মিতুল ফিরে না আসা পর্যন্ত সীতার ভীষণ খারাপ লাগে! তারপর তপনের কথা, এয়ার ফোর্সের অসংখ্য মানুষের সুখ-দুঃখের স্মৃতি নিয়ে সীতার দিনগুলো কেটে যায়। কেটে যায় আরো কত দিন, কত মাস!

ছ'মাসের পর তপনের কোর্স শেষ হয়। শেষ হয় অনেক দিনের প্রতীক্ষা। ভোরবেলায় পিওন এসে জামাইবাবুর টেলিগ্রাম দিয়ে গেল, তপন প্রোমোটেড টু ফ্লাইট লেফট্যান্যান্ট, স্টপ রিজেয়েনিং স্কোয়াড্রন এ্যাট পুনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তপনের মা টেলিফোন করলেন।

মুহূর্তের জন্য সীতার কানে যেন খুব মিষ্টি মিহি সানাইয়ের সুর ভেসে এলো। আর মিতুলকে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে বল্লো, লক্ষ্মী মেয়ে! এই টাকাটা রাখ, চকলেট কিনে খাবি।'

॥ নয় ॥

কি জানি কি কারণে কোন সিনিয়র অফিসারই তপনের ছুটির ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তবে ঠিক বাধাও দিলেন না। হাজার হোক বিয়ের জন্য ছুটি! তবে সবাই বললেন, বেশী ছুটি দেওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত ছুটি মিলল দু'সপ্তাহের।

কলকাতা রওনা হবার আগে সবার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিল। সবাই শুভেচ্ছা জানালেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন মালহোত্রা শুভ কামনা জানিয়ে বললেন, 'বিয়ের পর কলকাতার বাইরে কোথাও যাবে নাকি।'

'ঠিক জানি না।'

গ্রুপ ক্যাপ্টেন একটু যেন ভেবে নিলেন। 'ইভন্ ইফ ইউ গো, কলকাতার বাড়িতে ফুল এ্যাড্রেস আর টেলিফোন নাম্বার রেখে যেও। এ্যাণ্ড খুব কাছাকাছি থেকো, বেশী দূরে যেও না।'

তপন একটু চিন্তিত না হয়ে পারল না। ইজ-দেয়ার এনি থিং রং স্যার?'

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এবার উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নো মাই বয়, নাথিং রং। সামথিং ইজ কুকিং আপ, আই মীন সামথিং স্পেশ্যাল।

অনেককেই জিজ্ঞাসা করল কিন্তু কেউই বিশেষ কিছু জানালেন না। অথবা জানাতে পারলেন না। তবে কিছু একটা হচ্ছে তা বুঝতে কষ্ট হলো না। বিশ্বাসের ছুটি মঞ্জুর হচ্ছে না তো বটেই উপরন্তু ওকে বললেন, ভ্যাম্পায়ার পাইলটদের এখন ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়।

যুদ্ধ লাগবে না তো? পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ? আশ্চর্য কিছু নয় তবে মনে হয় না। সিয়াটো আর সেণ্টোর সদস্য হবার পর থেকেই পাকিস্তান আমেরিকা থেকে শত শত কোটি কোটি টাকার অস্ত্র-শস্ত্র পেয়েছে ও পাচ্ছে। সেই সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুনিয়ায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটছে।

ইস্কান্দার মির্জা, আয়ুব আর মুসার অঙ্গুলিহেলনেই রাজনৈতিক নায়কদের আগমন-নির্গমন হচ্ছে। এত ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক টপ ব্রাসের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে। যুদ্ধ। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ।

এ নিয়ে অফিসারদের মধ্যে মাঝে মাঝেই আলোচনা হয়। কথাবার্তা হয় সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে নানা সময়। কেউই যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখেন না। তবে অসম্ভব একথাও কেউ বলেন না। বিশেষ করে একটি কারণে—পাকিস্তান পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত আর ভারতবর্ষ পুরোপুরি অপ্রস্তুত। দশ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু ডিফেন্সের ব্যাপারে সরকার বা দেশবাসীর কোন নজর নেই। ডিফেন্সের চাইতে খদ্দর আর চরকার ব্যাপারে সরকার বেশী উৎসাহী, বেশী উদার। শুধু তাই নয়, কোন আগ্রহ নেই. কোন প্রচেষ্টা নেই। এই দশ বছরে ভারতবর্ষের কোন ডিফেন্স মিনিস্টার ছিল না বললেই চলে। একজন ডিফেন্স মিনিস্টার তো ডিফেন্স মিনিস্ট্রীকে হিন্দীভাষা প্রচার সমিতি করে তুলেছিলেন। এই নিয়ে অফিসারদের মধ্যে কতো হাসাহাসি হতো। একজন এয়ার কমোডর তো একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন বয়েজ! খাদি ভাণ্ডারের পিওর মধু খাওয়া প্রাকটিশ করো। ডেঁজ আর কামিং, যখন হয়ত গভর্ণমেণ্ট হুইস্কীর বদলে খাদি ভাণ্ডারের মধু খাবার অর্ডার দেবে।

তাইতো যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের প্রচুর ফয়দা। বেশী দেরী করলে তত সুবিধা নাও হতে পারে। কৃষ্ণমেনন ডিফেন্স মিনিস্টার হওয়ায় ডিফেন্স সার্ভিসের সবাই খুশী হলেও পাকিস্তান অত্যন্ত চিন্তিত। উদ্বিগ্ন। তাছাড়া মেনন এসেই যেভাবে কাজকর্ম শুরু করেছেন তাতে আর্মি আর নেভীর চাইতে এয়ার ফোর্সের চেহারা একেবারেই পাল্টে যাবে বলে মনে হচ্ছে। সেইজন্যই কি পাকিস্তান আর সময় নষ্ট করতে চায় না। সেইজন্যেই কি ফাইটার পাইলটদের ছুটি দিতে এত অনিচ্ছা?

বিচিত্র একটা অস্বস্তি নিয়েই তপন বিয়ে করতে গেল। তবে বিয়েটা ভালই হলো। কোন ঘনিষ্ঠ বা সহকর্মী না এলেও খুব আনন্দ হলো। বিশেষ করে বাসরে। বাসরে বসার পরেই তপন সীতাকে বললো, 'আজ কিন্তু গান শুনব।'

সীতা হাসি মুখে মাথা কাত করে বললো, 'শোনাব।'

শান্তাবৌদি বললেন, 'তুমি কি ওর গান শোনোনি যে বাসরে আসতে না আসতেই গান শুনতে চাইছ?'

আজ তপন পাল্টে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, বিয়ের আগে উইং কমাণ্ডার আপনার রূপ-গুণ উপভোগ করলেও আমি তা করিনি।

'একটি চড় খাবে।'

'চড় মারলেই কি অতীত ইতিহাস ঢাকা দেওয়া যাবে?' এবার শান্তাবৌদি বোনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যারে, ও তোর গান শোনেনি?'

সীতা চোখ বুজে মাথা নেড়ে জানাল, 'না শোনেনি !'

শান্তাবৌদি অবাক হলেন, 'কেন ?'

তপন বললো, 'জবাবটা আমি দিচ্ছি।'

'কেন সীতা জবাব দিতে পারে না ?'

'আজ থেকে সীতা শুধু আমাকেই জবাব দেবে, আর কাউকে না।'

সীতার এক বান্ধবী মন্তব্য করল, 'এমন সৈন্যের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই দিদি।'

'তা ঠিক।'

তপন সত্যিই এতদিন সীতার গান শোনেনি। বলেছে, 'না, না, এখন গান শুনব না। যেদিন সত্যি সত্যিই তুমি আমার হবে সেইদিনই তোমার গলায় আমার জীবন-সংগীত শুনব।'

যাই হোক আরো কিছুক্ষণ হাসি-ঠাট্টার পর সীতা হারমোনিয়াম টেনে নিলো। একটু বাজিয়ে. মনে মনে একটু সুর ঠিক করে শান্তাবৌদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি কি গাইবো বলতো !'

সীতার আরেক বান্ধবী বললো, এয়ার ফোর্স অফিসার গানের কি বোঝে ? হয় বন্দেমাতরম, না হয় আমি বনফুল গো শোনা !'

হাসি উঠল চারদিক থেকে।

তপন বললো, 'আপনার গলায় অবশ্য সবই সমান !'

'তা তো বটেই ! দে তো সীতা হারমোনিয়ামটা।'

'খবরদার ! আপনি গান গাইলে কিন্তু এক্ষুনি ডিভোর্স হয়ে যাবে।'

'লেট মী সী।'

'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আই কাণ্ট লেট ইউ সী।'

আবার হাসি। একটু কলগুঞ্জন। একটু টিকা-টিপ্পনী। শেষ পর্যন্ত সীতা শুরু করল. 'ভালবেসে সখী. নিভৃত যতনে আমার নামটি লিখো— তোমার মনের মন্দিরে !'

'প্রথম দিন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লিখে রেখেছি।'

গানের মাঝখানে তপনের কথায় সবাই একটু হাসল।

'আমর পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখো—তোমার
চরণমঞ্জীরে ॥
ধরিয়া রাখিও সোহাগে আদরে···'

তপন একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো, 'একটু ভীড় পাতলা হলেই ধরব।'

গান গাইতে গাইতে সীতাও না হেসে পারল না। শান্তাবৌদি পাশ ফিরে বললেন, জান অপর্ণা, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে করতে মনের কথাটা বললো।'

'আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কি না করেই মনের কথাগুলো খোলাখুলিভাবে বলতে পারি।'

অপর্ণা জানতে চাইল, 'আর কি পারেন?'

'আপনি মনে মনে যা ভাবছেন, তাও পারি?'

সবাই মুখ চাপা দেয়।

আবার গান শুরু হয়। শেষ হয়।······

'আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো—তোমার
অতুল গৌরবে॥'

তপন বললো 'অফ কোর্স'!'

কত হাসি, কত ঠাট্টা, কত গান হলো রাত ভোর।

সত্যি। সে এক স্মরণীয় রাত্রি। অমন রাত্রি আর হয়নি। জীবনে কত আনন্দ, কত উৎসব হয়েছে কিন্তু এমন মহোৎসবের স্বাদ কোনদিন ওরা পায়নি। কেউ পায় না। পেতে পারে না। সম্ভব না। অসম্ভব। কল্পনাতীত। জীবনের সমস্ত সাধনা দিয়ে, সত্ত্বা দিয়ে যাকে কামনা করা যায়, স্পর্শে-গন্ধে বসন্তের মদিরতা, তার সঙ্গে মিলন-রাত্রির কি তুলনা হয়?

না।

তাইতো ফুলশয্যার রাত্রে তপন সীতাকে বলেছিল, 'তুমি আমার আদি ও অন্ত। তুমি আমার অনন্ত।'

'আমি জানি।'

'কোন দ্বিধা নিয়ে তুমি আমার কাছে এলে না তো?'

'আমার মুখ দেখে তুমি বুঝতে পারছ না?'

'তোমার সারা মুখে এমন একটা পরিতৃপ্তির ছাপ লেগে থাকে, যে দ্বিধা থাকলেও তা ধরার ক্ষমতা আমার নেই।'

'না, না, তাই কি হয়? কোন সংকোচ, কোন দ্বিধা থাকলে তুমি ঠিক ধরতে পারবে।'

ঘরের বাইরে থেকে হঠাৎ বৌদির গলা ভেসে এলো, 'তোমাদের বকবকের জ্বালায় তো ঘুমুতে পারছি না।'

তপন সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে উঠে এসে জবাব দিল, 'আমাদের বকবক বন্ধ হলে তো তুমি ছট্‌ফট্ করে মরবে।'

'একটু দরজাটা খোলো তো।' বৌদি দাবী জানালেন।

তপন দরজা খুলে দিতেই বৌদি ওর কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াটস্ দি প্রবলেম? এয়ারক্রাফটের এঞ্জিন ট্রাবল নাকি রানওয়ে ইজ নট রেডি?'

হাসতে হাসতে তপন বললো, তোমার মত শত্রু বিমান ঘোরাঘুরি করলে···'

কিছু হাসি-ঠাট্টা করে বৌদি চলে গেলেন। তারপর আরো কত কথা কত গল্প।

'ঘুম পাচ্ছে?' সীতার মুখটা আলতো করে তুলে ধরে তপন জিজ্ঞাসা করল।

সীতা ওর কানে কানে ফিস ফিস করে গাইল,

জাগরণে যায় বিভাবরী—
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি
আহা মরি মরি···

তপন ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, 'আমার গান তোমার ভাল লেগেছে?'

দুটি বাহু দিয়ে ওকে চেপে ধরে মুখের পর মুখ নিয়ে তপন বলে 'দারুণ, সুপার্ব'?

'তারপর?'

'তারপর আরো কত কি। শেষে আবার গান—'

'সময় আমার নাই যে বাকি,
শেষের প্রহর পূর্ণ করে দেব না কি ॥
বারে বারে কারা করে আনাগোনা
কোলাহলে সুরটুকু আর যায় না শোনা—
ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাঁকি ॥
পণ করেছি, তোমার হাতে আপনারে
শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একবারে।
মিটিয়ে দেব সকল খোঁজা, সকল বোঝা,
ভোরবেলাকার একলা পথে চলব সোজা—
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আঁখি ॥
সময় আমার নাই যে বাকি ···

বারান্দার দিকের জানালা থেকে হঠাৎ বৌদির গলা ভেসে এলো, সত্যিই আর সময় বাকি নেই।

চমকে উঠে দুজনে প্রায় ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বৌদি এবার বললেন, 'গুড নাইট! বেস্ট অফ লাক!'

হাকিমপেটে গিয়ে প্রথম প্রথম হুইস্কী খাবার পর যেমন বেহুঁস হয়ে রাতটা কাটিয়ে দিত, ঠিক তেমনি আচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কেটে গেল। টেলিগ্রামটা পেতেই নেশাটা কেটে গেল—সিলেকটেড্ টু প্রসিড টু ইউনাইটেড কিংডম টু রিং হান্টার স্টপ রিপোর্ট এয়ার কমোডর সায়গল এয়ার হেড কোয়ার্টার্স ওয়েডনেসডে ফিফ্টিন হানড্রেড্ আওয়ার্স স্টপ কনট্যাক্ট ও-সি ফ্লাইং ব্যারাকপুর ইমিডিয়েটলি।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মালহোত্রার টেলিগ্রামটা পড়েই ও চিৎকার করে উঠল, 'মা' আমি বিলেত যাচ্ছি !'

চিৎকার শুনে মা আর সীতা দুজনেই প্রায় ছুটে এলেন। মা ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করার পর দু'হাত জোড়া করে ভগবানকে প্রণাম জানালেন। 'দেখেছিস ঘরেতে লক্ষ্মী আসার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে ?'

ডিসপেন্সারীতে খবর দেবার জন্য মা ওপাশের ঘরে টেলিফোন করতে যাবার পরই তপন সীতাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আসার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলে ?'

সীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিনের জন্য যাচ্ছ ?'

'ঠিক জানি না তবে নিশ্চয়ই কয়েক মাস লাগবে !'

কেন ?'

'হান্টারের ট্রেনিং নিতে হবে না ? ট্রেনিং না নিলে ফ্লাই করব কি ভাবে ?

সীতা আর কোন কথা বললো না। চুপ করে তপনের বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে রাখল।

'তোমার মন খারাপ লাগছে ?'

'তুমি এত বড় সুযোগ পেলে আর আমার মন খারাপ লাগবে ?'

'তবুও ... '

'আমি দারুণ খুশী।'

'সত্যি ?'

'তোমাকে ছুঁয়ে মিথ্যে বলব ?'

'আমি জানি তুমি খুশী হয়েছ।'

তারপর বসে বসে অনেকক্ষণ কথা হলো। 'জান সীতা, এই জন্যই বেশি ছুটি পাইনি।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ। গ্রুপ ক্যাপ্টেন মালহোত্রা তো বলেই ফেললেন, সামথিং ইজ কুকিং আপ।'

'আচ্ছা ?'

'কিন্তু তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'তুমি কাউকে জিজ্ঞেস করনি ?'

'অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু কেউই কিছু বলেন নি। এখন বুঝতে পারছি এই সিলেকশনের জন্যই কোন ভ্যাম্পায়ার পাইলটকে ছুটি দেওয়া হচ্ছিল না ...'

'তাহলে হয়ত বিশ্বাসদাও সিলেকটেড্ হয়েছেন...'

'মোস্ট লাইকলি !'

দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই সারা বাড়িতে ভীড় জমে গেল। দাদাবৌদি একটু

কাজে বেরিয়েছিলেন। ওরা ঘুরে আসতেই নতুন করে উৎসবে মেতে উঠলেন সবাই। তপন বেশীক্ষণ থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে বারাকপুর চলে গেল। ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল। একটু পরেই উইং কমাণ্ডার সেনগুপ্তের গ্রিটিংস টেলিগ্রাম এলো। মিতুলকে নিয়ে সীতার বাবা-মা'ও এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। ডাঃ সরকার আর ডিসপেন্সারী গেলেন না। কম্পাউণ্ডারকে বলে দিলেন জরুরী কেস এলে বাড়িতে ফোন করতে।

খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। শুতে যাবার আগে বৌদি তপনকে ছাদে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সীতাকে নিয়ে দিল্লী যাবে?'

তপন আনন্দে লাফিয়ে উঠল, 'লাভলি আইডিয়া কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'তুমি ম্যানেজ করতে পারবে?'

'সে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি নিয়ে যেতে চাও?'

'একথা আবার তুমি জিজ্ঞাসা করছ?' তপন একটু থেমে আবার শুরু করে, 'কিন্তু—'

বৌদি যেন বিরক্ত হন, 'আবার কি হলো?'

'ও আসবে কি ভাবে?'

'তোমার কোন বন্ধু ওকে প্লেনে চড়িয়ে দিতে পারবে না?'

'তা কেন পারবে না?'

'তবে আবার কি? তুমি আগের থেকে একটা টিকিট কেটে রেখো। তারপর তোমাকে সী-অফ্ করে ও চলে আসবে…'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? আমরা এখানে নামিয়ে নেব।' বৌদি এবার ওকে সতর্ক করে দেন, সীতাকে এখন কিছু বলো না। একেবারে স্টেশনে গিয়ে ওকে ট্রেনে তুলে দেব। সেই ভাল হবে না?'

'তুমি সত্যিই গুরুদেব!'

যাবার দিন স্টেশনে গিয়ে বৌদি যে নাটক পরিচালনা করলেন তার কোন তুলনা হয় না। সীতার সুটকেশটা লুকিয়ে বার্থের নিচে রেখে দিয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই কথাবার্তা বললেন। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে তপনের কুপেতে গিয়ে সবাই ভীড় করলেন। অনেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন কিন্তু সীতা দেখতে পায়নি। আপন মনে মুখ নিচু করে বসেছিল। ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগে তপন সবাইকে প্রণাম করে আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিল। বৌদি সীতাকে বললেন, 'তুমিও প্রণাম কর।'

সীতা অবাক হয়ে বৌদির দিকে তাকাল।

সীতা কোন কথা না বলে সবাইকে প্রণাম করল।

হুইসেল বেজে উঠল।

সবাই ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। সীতা একবার শূন্য দৃষ্টিতে তপনের দিকে তাকিয়ে নামতে যেতেই বৌদি বললেন, 'এক্ষুনি নেমো না।'

বৌদি নেমে যেতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সীতাও নামতে যেতেই তপন টেনে ধরল। বৌদি চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে এগুতে এগুতে বল্লেন, 'বী হ্যাপি!'

সন্ধ্যার অন্ধকারে প্ল্যাটফর্মের পরিচিত মূর্তিগুলো আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হলো, তারপর মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে মিশে গেল।

আর?

কালকা মেলের অন্ধকার কুপে'তে দুটি প্রাণের প্রদীপ অপ্রত্যাশিত আনন্দে জ্বলে উঠল।

॥ দশ ॥

গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডি'সুজার নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের হাণ্টার টিম লণ্ডন এয়ারপোর্টের মাটিতে পা দিতেই রয়্যাল এয়ারক্রাফট্ এস্টাবলিস্মেণ্টের গ্রুপ ক্যাপ্টেন বার্ন ও আরো অনেকে অভ্যর্থনা জানালেন। টার্মিন্যাল বিল্ডিং'এর কাস্টমস এনক্লোজারে দাঁড়িয়ে দু'চার মিনিট কথাবার্তা বলতে বলতেই সবার লগেজ এসে গেল! তারপর আর এক মিনিটও সময় লাগল না। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বার্ন কাস্টমস অফিসারকে শুধু বললেন, 'দে আর দি গেস্টস অফ রয়্যাল এয়ারক্রাফট্ এস্টাবলিস্মেণ্ট।'

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে ছুটি। কাস্টমস্'এর চাকরি করলেও রয়্যাল এয়ারক্রাফট্ এস্টাবলিস্মেণ্ট ওদের অপরিচিত নয়। ব্রিটেনের সামরিক ও অসামরিক বিমান তৈরীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হচ্ছে এটি। যাই হোক 'টার্মিন্যাল বিল্ডিং'এর বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেই গাড়িতে সোজা ফার্নবরো। হ্যাম্পশায়ারের এই ছোট্ট শহরটিই রয়্যাল এয়ারক্রাফট্ এস্টাবলিসমেণ্টের প্রাণকেন্দ্র। ভ্যাম্পায়ার হাণ্টার, ক্যানবেরা, জ্যাভেলিন, ন্যাট লাইটনিং ও আরো কত ফাইটার-এখান থেকে বেরিয়েছে। আরো কত বেরুবে, তা কে জানে!

ফার্নবরোতো পেঁছে সবাই একটু চঞ্চল না হয়ে পারল না। যে কোন পাইলটের পক্ষেই খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডি'সুজা ছাড়া আর কেউ এর আগে বিলেতের মাটিতে পা দেয়নি। তপন আর বিশ্বাস এক সঙ্গে এসেছে বলে ওরা আরো বেশী আনন্দিত, উত্তেজিত। গিল আর ভরদ্বাজ এলে আরো মজা হতো। তবে ওরা নাকি 'ক্যানবেরা' টিমে সিলেকটেড হয়েছে।

আসার সময় জেনেভা এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে বসে গল্পগুজব করতে করতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ খবর ওদের জানিয়েছিলেন।

হ্যাম্পশায়ারের নিউ ফরেস্টের এই শহরটি ভারী সুন্দর। ভারী শান্তিপূর্ণ। ছিমছাম পরিষ্কার। ভীড় নেই। কোন চেঁচামেচিও নেই। তবে উপরের আকাশ বড় কর্মব্যস্ত। দিবা-রাত্রি। অজস্র ফাইটার আর বোম্বার ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্কোয়াড্রন লীডার রবার্টসন প্রথম দিন ওদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন। আলাপ করিয়ে দিলেন অনেকের সঙ্গে। সব কিছুই ইনফরম্যাল। তবুও ঠাসা এনগেজমেণ্ট। সন্ধ্যায় কক্‌টেল আর ডিনার। ছুটি হলো মাঝরাতের বেশ কিছু পরে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তবুও তপন সীতাকে একটা চিঠি না লিখে পারল না।

ঝড়ের বেগে নয়, প্রায় সাইক্লোনের বেগে ছ'টা মাস কেটে গেল। শনিবার-রবিবার ছুটি থাকত ঠিকই কিন্তু প্রথম তিন মাস এত বেশী পড়াশুনা করতে হতো যে ছুটির দিনে আরো বেশী পরিশ্রম হতো। লণ্ডন মাত্র ঘণ্টা খানেকের পথ। প্রথম তিন মাসে মাত্র দুদিন যেতে পেরেছিল। তারপর অবশ্য প্রত্যেক মাসেই গেছে। কখনও একবার, কখনও দু'বার। তপন প্রত্যেক সপ্তাহে একটার বেশী চিঠি লিখতে পারত না সীতাকে—'দিনগুলো যে কিভাবে কাটছে তা আমরা কেউ টের পাচ্ছি না। এক মুহূর্ত ফুরসত নেই। কারুরই নেই। লাঞ্চ বা টি ব্রেকের সময় ছাড়া নিজের সহকর্মীদের সঙ্গেও এক মিনিট কথা বলতে পারি না। যাইহোক ট্রেনিং বেশ ভালভাবেই চলছে। বিশ্বাসকে তো চীফ ইনস্ট্রাকটারের খুব ভাল লেগেছে। তবে আমাদের সবার সম্পর্কেই ওদের খুব ভাল ধারণা হয়েছে।'

'আর কি লেখে ?'

লেখে, 'দিনগুলো ঠিকই কাটছে তবে রাত্রিতে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ার টেবিলে তোমার ছবিটা দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়। ঘরে ঢুকেই ছবিটা হাতে তুলে নিই। অনেকক্ষণ শুধু দেখি। সত্যি ভারী সুন্দর তোমাকে দেখতে। আমার মাথাটা কি এমনি এমনিই খারাপ হয়েছিল ? তারপর ঐ ছবিটাকেই আদর করি। ভালবাসি। কি করব ? না করে পারি না।'

'তারপর ?'

'শুতে যাবার সময় প্রায় কান্না পেয়ে যায়। শুতে যাবার আগে শূন্য বিছানার দিকে তাকালেই মনটা বিষন্ন হয়ে যায়। ভাল লাগে না। মনে হয় সিলেকটেড না হলেই ভাল হতো। তোমাকে পাবার পর পরই এমন করে না চলে এলেই ভাল হতো। বিশেষ করে দিল্লী আসার সময় ট্রেনের চব্বিশ ঘণ্টার কথা বার বার মনে পড়ে। সময় পেলেই মনে পড়ে। রোজ রাত্রে মনে পড়ে। বিলেতে আসার চাইতে তোমাকে নিয়ে যদি কালকা মেলের কুপেতে ঘুরে

বেড়াতে পারতাম তাহলে অনেক শান্তি পেতাম, সুখী হতাম। তাই না সীতা ?'

সীতা লেখে, 'তুমি তো সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকো, কিন্তু আমি ? আমার তো কোন কাজ নেই, কোন দায়িত্ব নেই। আছে শুধু চিন্তা। তোমার চিন্তা। আগে কতজনের কথা ভাবতাম। এখন শুধু তোমার কথাই ভাবি। আর কারুর কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না, প্রয়োজন বোধ করি না, তাগিদ বোধ করি না। এত দিন যারা আমার অত্যন্ত আপন, কাছের মানুষ ছিল, হঠাৎ যেন তারা সবাই আমার জীবন-নাট্যে তুচ্ছ নগন্য পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করেছে। যারা আগে কাছে ছিল, তারা দূরে সরে গেছে। আর দূরের তুমি আমার সব চাইতে কাছের মানুষ মনের মানুষ হয়েছ। এই অবস্থায় একা একা যে কী কষ্টকর তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।'

রাত্রে মন খারাপ হলেও দিনের বেলায় যখন হান্টারের ককপিটে বসে, যখন ওকে নিয়ে আকাশের কোলে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ায় তখন কিন্তু তপনের বেশ লাগে। খুব ভাল লাগে। জেট ফাইটার হিসেবে এর যেন তুলনা হয় না। থাউজ্যান্ড ইয়ার্ডেই টেক অফ্। এয়ারক্রাফট্ লোডেড থাকলে অবশ্য তেরোশ' —চোদ্দশ' গজ রানওয়ে লাগে। ল্যান্ড করার সময় অবশ্য দেড় হাজার—দু'হাজার গজ রানওয়ে না হলে চলে না। তিরিশ এম, এম, চারটি কামান। গ্রাউন্ড সাপোর্ট বা এয়ার ডিফেন্সের জন্য চমৎকার। এছাড়াও চব্বিশটা ব্রিটিশ তিন ইঞ্চি রকেট অথবা ষোলটা টি-টেন নেওয়া যায়। আর কি চাই ? এর উপর ক্যানবেরা আর ন্যাট আসছে। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের চেহারাই পাল্টে যাবে।

ছ'মাস পর যেদিন রয়্যাল এয়ারক্রাফট্ এসটাবলিসমেন্টের পক্ষ থেকে এক স্কোয়াড্রন হান্টার ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সকে দেওয়া হলো, সে এক স্মরণীয় দিন। ব্রিটেনের মিনিস্টার অফ এভিয়েশন আনুষ্ঠানিকভাবে পেপার্স এ্যান্ড ডকুমেন্টস ইন্ডিয়ান হাই কমিশনারের হাতে তুলে দিলেন। তারপর গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডি'সুজা প্রথম হান্টারটি নিয়ে আকাশে উড়লেন। তারপর ওরা। একের পর এক, পর পর। ডিমনোস্ট্রেশন শেষ হবার পর প্রত্যেকটি পাইলটকে ব্রিটিশ এভিয়েশন মিনিস্টার সার্টিফিকেট আর মোমেন্টো প্রেজেন্ট করলেন।

এরপর এভিয়েশন মিনিস্টারের লাঞ্চ। তারপর ছুটি।

'সীতা, বনবাস শেষ হলো। সীতাকে হারিয়ে মনের অরণ্যে নিঃসঙ্গবাসের পালা শেষ হলো। শেষ হলো তোমার-আমার ধৈর্যের পরীক্ষা, ভালবাসার অগ্নিপরীক্ষা। এবার আসছি। তোমার কাছে আসছি। তবে এবার আর এয়ার ইন্ডিয়ার সুন্দরীদের সান্নিধ্যে নয়, নিজেরাই নিজেদের এয়ারক্রাফট নিয়ে আসছি। এখান থেকে পুণা পর্যন্ত হান্টার নিয়ে ফ্লাই করব বলে আমরা সবাই খুব উত্তেজিত। এমন সুযোগ আর কবে পাব জানি না·····'

'যাইহোক তোমার আর তামসীর জন্য আমি আর বিশ্বাস কয়েকটা খুব মজার জিনিস কিনেছি। প্রাইভেট এ্যান্ড কনফিডেন্সিয়্যাল। মেয়েদের এসব জিনিস আমাদের ওখানে পাওয়া যায় না। কল্পনাতীত।'

পুণাতে ফিরে আসার পরই তপন কোয়ার্টার পেল। সীতা এলো। এতদিন পর শুরু হলো ওদের দ্বৈত জীবন। নতুন জীবন।

খুব ভোরবেলায় তপন উঠে পড়ে। বাথরুমে যায়। তারপরই সীতা উঠে পড়ে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় একবার নিজেকে দেখে বেসিনের সামনে যায়। চোখে-মুখে জল দেয়। তারপর তপনের ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে শুরু করে। ডাইনিং টেবিলে খাবার-দাবার সাজাতে সাজাতেই ও ইউনিফর্ম পরে এসে পড়ে। ব্রেকফাস্ট খায়। সীতা চা খায়। টুকটাক কথা হয়। হয়ত একটু হাসি, একটু রসিকতা। সামান্যই। বেশী কথা বলার সময় থাকে না।

তপন বেরুবার আগে সীতাকে একবার কাছে টেনে নেয়। সীতাও দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'বী কেয়ারফুল।'

তপন হাসে। বলে, 'গ্রাউন্ড কন্ট্রোল আর গ্রাউন্ড ফেসিলিটি এত ভাল হলে পাইলট কখনও কেয়ারলেস হতে পারে?'

'দেরী হবে না তো?'

'না, না, দেরী হবে কেন?'

'কটা সর্টি ফ্লাই করবে?'

'চার-পাঁচ সর্টির বেশী কি ফ্লাই করব?'

'ক'দিন যে দু'তিন সর্টি ফ্লাই করছিলে?'

উৎকণ্ঠার কারণ বুঝতে পারে তপন। পাঁচ-ছ'শ মাইল স্পীডে ফাইটার এয়ারক্রাফট নিয়ে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার ফিট উপরে বার বার ফ্লাই করলে ওদের চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। তপন ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে, 'কোন চিন্তা নেই, তাড়াতাড়িই ফিরব।'

ও যতই বলুক সীতা না ভেবে পারে না। চিন্তা হয়। হবেই। কাজকর্ম করতে করতেই খেয়াল রাখে, শুনতে পায় পর পর ছ'টা হান্টার টেক-অফ্ করল। আধ ঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর প্রথম এয়ারক্রাফট ল্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গেই শত ব্যস্ততার মধ্যেও সীতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। মনে মনে হিসাব করে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়! হঠাৎ আনন্দে খুশীতে ঝলমল করে ওঠে সীতা। তাহলে সবাই ঠিকমত ফিরে এসেছে। আপন মনে গেয়ে ওঠে, 'সেই ভালো সেই ভালো, আমারে না হয় না জান, সেই ভালো সেই ভালো।'

কিছুক্ষণ বেশ কেটে যায়। আবার যখন হঠাৎ টেক অফ্ করার গর্জন শুনতে পায় তখন আবার গুণতে শুরু করে এক, দুই, তিন……

সেদিন বুধবার। ইভনিং'এ একটা 'ফেটে' আছে বলে সীতা কিছু স্পেশ্যাল

রান্নাবান্না করতে ব্যস্ত। হঠাৎ থার্ড সর্টি ফ্লাই করার পর খেয়াল করল একটা এয়ারক্রাফট্ ল্যান্ড করল না। কি সর্বনাশ! রান্নাঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দূরের রানওয়ের সীমাহীন আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ। না, কোন এয়ারক্রাফটের চিহ্ন নেই। কোন আওয়াজ নেই। নির্মম আকাশ তখনও নির্লিপ্ত, উদাসীন। দেখতে দেখতে পাঁচ-দশ মিনিট কেটে গেল। সীতা আর পারল না। ছুটে গেল স্কোয়াড্রন লীডার ভোঁসলের কোয়ার্টারে। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে মিসেস ভোঁসলেকে বললো 'খেয়াল করেছেন একটা এয়ারক্রাফট্ ল্যান্ড করেনি?'

'করেনি।'

'কি হয়েছে? ক্রাশ করেনি তো?' এক নিঃশ্বাসেই জিজ্ঞাসা করল, 'কে ফ্লাই করছিল কে জানে?'

মিসেস ভোঁসলেও খেয়াল করেছেন। তবে তখনও টেলিফোন করেন নি। 'দাঁড়াও, দু'চার মিনিট দেখে টেলিফোন করছি।'

'এখনই করুন না!'

'এখন টেলিফোন করলেও কিছু বলবে না।'

শূন্য আকাশের দিকে দুজনেই আরো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। অস্থির, উদ্বিগ্ন হয়ে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। তারপর কিছু না বলে মিসেস ভোঁসলে ড্রইং রুমে টেলিফোন তুলতেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সীতা চীৎকার করে উঠল, 'ইয়েস! ইট হ্যাজ কাম!'

ঝপাং করে রিসিভার নামিয়ে রেখে মিসেস ভোঁসলে বেরিয়ে আসতে আসতেই এয়ারক্রাফট্টা গর্জন করে রানওয়েতে নেমে এলো।

তপন ফিরে আসতেই সীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল আজ? কে ফ্লাই করছিল?'

'তুমি বুঝি খুব ভাবছিলে?'

'ভাবব না? যদি কোন…'

তপন ওর মুখটা চেপে ধরে বললো, 'ওসব ভাবে না।'

'কিন্তু কি হয়েছিল?'

'একটা এয়ারক্রাফট্'এর আন্ডার-ক্যারেজ রিলিজ হচ্ছিল না।'

'কে ফ্লাই করছিল?'

'আমি না।'

'তবুও শুনি।'

'বিশ্বাস।'

সীতা চমকে ওঠে, 'বিশ্বাসদা?'

'হ্যাঁ।'

'টেক-অফ্ করার আগে নিশ্চয়ই ভালভাবে চেক আপ করা হয়নি।' একটু বিরক্ত হয়েই সীতা মন্তব্য করল।

তপন মৃদু হাসল। চেক আপ করলেও এমন হয়। ইট জাস্ট হ্যাপেনস্ সাম টাইম।'

ওর কথায় সীতা খুশী হতে পারে না। অস্বস্তি কাটে না। 'একটা কথা রাখবে?'

'কি বল।'

'বল রাখবে?'

'তোমার কোন কথা রাখিনি বলো তো?'

'বিশ্বাসদাকে মেস থেকে নিয়ে এসো না! আমরা একসঙ্গে খেতাম।'

তপন হাসে। 'বিশ্বাসকে না দেখে বুঝি শান্তি পাচ্ছ না?'

তপন আর কথা বলে না, তর্ক করে না। স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মেস থেকে বিশ্বাসকে নিয়ে আসে।

সীতা বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল। একবার বিশ্বাসকে খুব ভাল করে দেখে নিল। তপন আর বিশ্বাস—দুজনেই ওকে দেখে একটু না হেসে পারল না। বিশ্বাস সীতার সামনে এসে দাঁড়াল। 'তুমি বুঝি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল?'

'ঘাবড়াবো না?'

'তাই বলে কিছু জানার আগেই মিসেস ভোঁসলের কাছে গিয়ে কাঁদছিলে কেন?'

'কে বললো কেঁদেছি?' সীতা একটু লজ্জিতা হয়ে বললো, 'মোটেও কাঁদিনি শুধু খবর নিতে গিয়েছিলাম।'

সীতার উৎকণ্ঠায় বিশ্বাস মুগ্ধ না হয়ে পারল না। আনন্দে, তৃপ্তিতে, ভালবাসার গভীরতায় সারা মনটা ভরে গেল। 'ভয় নেই, তোমাদের রেখে পালাব কোথায়?'

খেতে বসে সীতা বললো, 'টেক-অফ্ করার আগে নিশ্চয়ই ভালভাবে চেক আপ করে নেননি। আপনারা সব কিছুই বড় বেশী ক্যাজুয়ালি নেন।'

রাতের অন্ধকারে রোজ পৃথিবী ডুবে যায় বলেই সূর্যের আলোর জন্য মানুষের এত ব্যাকুলতা। শীতের জড়তা আছে বলেই বসন্তের এত সমাদর। প্রতিদিন নিত্য নতুন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থাকে বলেই এয়ার ফোর্সের সবাই বাঁচার আনন্দ, রস উপভোগ করতে পারে। জীবন-মরণ নিয়ে যারা নিত্য লুকোচুরি খেলে, যাদের বিরহ বেদনা নিত্য উপভোগ করা যায় তাদের জীবনের রস স্বতন্ত্র। আনন্দ অনেক গভীর, ভালবাসা সুতীব্র।

দিনগুলো বেশ কেটে যায়। হাসিতে, গানে ভরপুর হয়ে থাকে প্রতিটি মুহূর্ত। সীতা দারুণ খুশী। সুখী। শুধু ভোরবেলায় যখন তপন ঘুম থেকে ওঠে, তখন ভাল লাগে না। একটা মিষ্টি আমেজে মনটা ভরে থাকে। ও

উঠে গেলে হঠাৎ আমেজটা কেটে যায়। চুপ করে শুয়ে থাকলেও শূন্যতার জ্বালায় মনটা ছটফট করে। তবু সীতা শুয়ে থাকে। কিছুক্ষণ। সারা বিছানায় যেন তপনের গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। উঠতে চাইলেও উঠতে পারে না। বিছানাটারও যেন একটা নিজস্ব মোহ আছে। সে মোহ থেকে মুক্তি পাওয়া বড় কঠিন।

এপ্রিল মাসে বোম্বে চৌপাট্টির সমুদ্র পারে এয়ার শো হলো। সুরঞ্জন দাশ ন্যাটের ডিমনোস্ট্রেশন দেখালেন। পুণার অনেকেই হাণ্টার নিয়ে ফ্লাই করল। নানা রকমভাবে ফ্লাই করল। তপন ওর হাণ্টার থেকে রকেট ফায়ার করল। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখল। মাঝে মাঝে এমন সাংঘাতিকভাবে ওরা ফ্লাই করছিল যে সীতার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। ভয়ে, আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সব কিছু ভুলে গেল, আনন্দ-গর্বে অধীর হয়ে উঠল যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ওদের অভিনন্দন জানাল, যখন ডিফেন্স মিনিস্টার কৃষ্ণমেনন আর এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী পাইলটদের কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

'কেমন লাগল, সীতা?' বিশ্বাস জানতে চাইল।

গিলের মা বললেন, 'ওর ভীষণ ভয় করছিল।'

'ভয়? কেন?'

এবার সীতা কথা বলে, 'ভয় করবে না? কি ডেঞ্জারাসভাবে ফ্লাই করছিলেন?'

তপন বললো, 'ও বড় বেশী ভাবে।'

গিলের মা বললেন, 'ভাববে না বাবা? তোমরা এমনভাবে ফ্লাই করছিলে, যে সবাই ভাবছিল, না ভেবে পারছিল না।'

তপন বললো, 'এয়ার ফোর্স অফিসারের স্ত্রীদের এত ভাবনা-চিন্তা হলে চলে?'

তামসী আর চুপ করে থাকতে পারল না, 'দাদা, ওকথা বলবেন না। তোমাদের তো আমরা বাধা দিই না কিন্তু তাই বলে ভাবনা-চিন্তাও হবে না?'

অভিমান করে সীতা বললো, 'তামসী, তুমি ওদের বোঝাবার চেষ্টা করো না। ওরা কি ওসব বোঝে?'

গিলের মা তর্ক থামিয়ে সীতাকে বললেন, 'বেটি, একটা ভক্তির গান শোনাও তো।'

'আপনার ছেলেদের যেতে বলুন।'

গিলের মা না হেসে পারলেন না। 'কেন মা? ওরা আর কোন কথা বলবে না।'

সীতা তারপর গায়, 'তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে।'

গান শেষ হলে গিলের মা ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'চমৎকার।'

॥ এগার ॥

হাণ্টার, ক্যানবেরা আর ন্যাট আসার পর ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যেন যৌবন এলো। উম্মাদনা এলো বৈমানিকদের জীবনেও। নতুন কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ারে ভেসে গেল তপন, বিশ্বাস, গিল, সবাই।

যখন এগিয়েছে তখন খেয়াল হয়নি। যখন থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে তাকাল, তখন বুঝতে পারল হাণ্টার-ক্যানবেরা-ন্যাটের চাইতেও দ্রুত গতিতে সময় কেটে গেছে। এমন হয়। সবার জীবনেই হয়। কোন না কোন সময় হয়। ক'টা বছরে কত কি হয়ে গেছে। বিশ্বাস, গিলের বিয়ে হয়েছে। কারুর বিয়েতেই ওরা যেতে পারেনি। তেজপুরে থাকার সময়েই ওদের দুজনের বিয়ে হয়। কিছুতেই যাওয়া সম্ভব হয়নি। ছুটি পায়নি। বিয়ের পর সীতা ওদের কাউকেই দেখেনি, তবে তপন দেখেছে। একটা কোর্ট অফ এনকোয়ারিতে সাক্ষী দেবার জন্য দিল্লী গেলে ওদের দুজনের সঙ্গেই তপনের দেখা হয়। ভাগ্যক্রমে ওরা দুজনেই তখন দিল্লীতে। বিশ্বাস পালামে আর গিল এয়ার হেড কোয়ার্টার্সে পোস্টেড। দুজনেরই কোয়ার্টার পালামে ছিল। প্রায় পাশাপাশি। তপন মাত্র তিনদিন ছিল। তা হোক। খুব আনন্দ করেছে। প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়েছে।

গিলের স্ত্রী প্রমীলা মেয়েটিও বেশ ভাল। জন্ম ইস্ট আফ্রিকায় লেখাপড়া শিখেছে লণ্ডনে। ওর বাবা আগে ইস্ট আফ্রিকায় ব্যবসা করতেন। পরে লণ্ডনে। স্ত্রী মারা যাবার পর উনি দুই মেয়েকে নিয়ে ইণ্ডিয়ায় চলে আসেন কিন্তু তিন ছেলেই লণ্ডনে থেকে যায়। বড় দুজনে ব্যবসা করে, ছোটটি পড়ছে।

গিলের বিয়ে হবার কাহিনীটা সত্যি ভারী মজার। বোম্বেতে আসার এক মাসের মধ্যেই প্রমীলার দিদির বিয়ে হয়। বাঙ্গালোরে। ছোট মেয়েকে নিয়ে বোম্বে থাকলেও মিঃ সিং মাঝে মাঝে বাঙ্গালোর যাতায়াত করেন।

সেবার বাঙ্গালোর গিয়েছিলেন। সান্তাক্রুজে নামার পর জানতে পারলেন সেদিন বোম্বেতে জেনারেল স্ট্রাইক। শিবসেনার ডাকে স্ট্রাইক হয়েছে। সকালে, দুপুরে শহরের কয়েকটা জায়গায় বেশ গণ্ডগোল হয়েছে। পুলিশ লাঠি চালিয়েছে, গুলী ছুঁড়েছে, কাঁদুনে গ্যাস ফাটিয়েছে। এয়ারপোর্টে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। এয়ারপোর্টও বেশ ফাঁকা ফাঁকা। লোকজন বিশেষ নেই। দু'চারটে প্রাইভেট গাড়িকে অনুরোধ করেও লাভ হলো না। গুরুবচন এক বন্ধুকে ছাড়তে এসেছিল এয়ারপোর্টে। বন্ধুকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘুরাতেই মিঃ সিং হাত তুলে ওকে থামতে বললেন। গুরুবচন ব্রেক করল। উনি এসে একটা লিফট দেবার অনুরোধ করতেই ও রাজী হলো।

সেই আলাপ। তারপর একদিন গুরুবচনের নেমন্তন্ন। কথাবার্তা গল্প-

গুজব করে প্রমীলাকে ওর বেশ লাগল। বাড়িতে এসে মাকে বললো, 'দাদার সঙ্গে বিয়ে দিলে বেশ হয়।'

দুই পরিবারের মধ্যে আসা-যাওয়া মেলামেশা একটু বাড়তেই মিঃ সিং নিজেই একদিন প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব শুনেই গুরুবচন আর ওর মা হো হো করে হেসে উঠলেন। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

প্রমীলার সঙ্গে কয়েকবার গিলের দেখা হয়েছে ওদেরই বাড়িতে। তবে ভাবতে পারেনি বিয়ে হবে। অপছন্দ করার মত মেয়ে নয়, তার উপর আগ্রহ। শান্ত স্নিগ্ধ গিলকে প্রমীলারও বেশ লেগেছিল।

'বিয়ে হলো।'

প্রমীলার সঙ্গে গুরুবচন খুব ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে। 'হঠাৎ কফি নিয়ে এলে? আমাকে বুঝি দেখতে ইচ্ছে করছিলো?'

'তুমি কি ফিল্ম স্টার যে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করবে?'

'আমি কি জানি না আমাকে বিয়ে করারই তোমার মতলব ছিল…'

'এই সকালবেলায় মার খেতে চাও?'

'দেখ দ্রৌপদী, যে অর্জুন তোমাকে জয় করে এই সংসারে নিয়ে এলো তাকেই মারবে?'

প্রমীলা সত্যি সত্যিই ওর পিঠে দুম্ করে একটা কিল মারে।

কখনও কখনও গুরুবচন ওর ভাবীজিকে বলে, তোমরা তিন ভাইয়ের বদলে তিন বোন হতে পারলে না?'

'তোমার ফরমায়েস মত আমাদের ভাই-বোন হবে?'

'হলে ভাল হতো।'

'কেন?'

'আমার প্রবলেমটাও মিটে যেতো।'

'বাপরে বাপ! কি বিয়ে পাগল ছেলে।'

দিল্লীবাসের তিনটি দিন এই প্রমীলা আর তামসীর যত্নে পাগল হয়ে উঠেছিল তপন। এত খাতির-যত্ন করলে থাকা যায়?'

তামসী বলেছিল, 'দাদা, আপনাকেও যত্ন করব না? আপনি না থাকলে আমি এই মর্যাদা নিয়ে সংসার করতে পারতাম?'

তুমি সংসার করছ তোমার নিজের অধিকারে।'

প্রমীলা বলেছিল, স্বামীর সংসার করলেও আপনিই তো রিয়েল 'বস্'।'

'তার মানে?'

'শাশুড়ী, স্বামী, দেবর, বিশ্বাসদা, তামসী—সবাই আপনার কথা এত

বলেন যে আপনাকে হেড অফ্ দি ফ্যামিলী মনে না করে উপায় আছে ?'

তপন হাসে। 'ওরা সবাই যে আমাকে ভীষণ ভালবাসে।'

'ওরা ভালবাসলে আমার কি ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে নেই ?'

পিছন ফিরে তাকাতে কত মিষ্টি স্মৃতি মনে পড়ে তপনের! সীতার। তবে গিলের মা নেই ভাবতে গেলেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। দুজনেরই। এমনভাবে হঠাৎ উনি চলে যাবেন কেউ আশা করেনি। ভাবতে পারেনি।

আরো কত কিছুই তো আশা করেনি, ভাবতে পারেনি। সলিলদা এমন অকস্মাৎ মারা যাবেন, কেউ কি ভাবতে পেরেছিল ?

না।

কেউ ভাবেনি। এত ভাল পাইলটের এমন পরিণতি, কেউ আশা করেনি। ভালচ্যার এয়ারক্রাফটে হিট্ করতেই উনি সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড হন। তবুও ঠিক মতই ল্যাণ্ড করছিলেন। ল্যাণ্ডিং-এর সব ভাইটাল এ্যাকসান নিয়েছিলেন। রানওয়ের জন্য এয়ারক্রাফট্ এ্যাডজাস্টও করেন। ল্যাণ্ডিং-এর জন্য আণ্ডার-ক্যারেজ রিলিজ করার পর পরই ফুয়েল ট্যাংকে আগুন ধরে যায়। সেই সর্বনাশা আগুনেই এয়ারক্রাফট্ আর সলিলদা—দুই-ই শেষ হয়ে গেল।

শকুন্তলাবৌদি বাড়ি ছিলেন না। ডিসপেন্সারী গিয়েছিলেন। সন্দেহ করেছিলেন হয়ত কনসেপ্শন হয়েছে কিন্তু আগে থেকে কাউকে কিছু বলেন নি। সলিলদাকেও না। এর আগে একবার ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। তখন তিনিও কনফার্ম করেন নি। সেদিনই ডাক্তার কনফার্ম করে বললেন. 'ইয়েস মিসেস ঘোষ, ইউ আর গোয়িং টু বী এ মাদার।'

মা হবার আনন্দে উল্লসিত হয়ে বাড়ি ফিরতেই ওদের টেলিফোন বেজে উঠল।

শকুন্তলাবৌদি রিসিভার তুলেই বললেন. 'ইয়েস টু-ফাইভ-নাইন।'

'ম্যাডাম' জাস্ট হোল্ড অন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শেঠী আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন কথা বলবেন ? শকুন্তলাবৌদি অবাক হন, চমকে ওঠেন। কি ব্যাপার ? কোন পার্টির জন্য নেমন্তন্ন নাকি ?

হঠাৎ গ্রুপ ক্যাপ্টেনের গলা ভেসে এলো. সিস্টার, একটু আসতে পারি ?

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন ?'

'একটু জরুরী দরকার আছে।' গ্রুপ ক্যাপ্টেন আর বেশী কথা না বলে শুধু বললেন, 'এক্ষুনি আসছি।'

গ্রুপ ক্যাপ্টেন একা এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন ওর স্ত্রীকে। ওদের দুজনকে দেখেই শকুন্তলাবৌদি বোধহয় অদৃষ্টের ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিলেন। হঠাৎ হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মিসেস শেঠীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কোথায় ? সলিল কোথায় ?'

'আর কোথায় ?'

আকাশে বিচরণ করেও রোজ যে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসত, সেই মাটির পৃথিবীতে চিরদিনের মত মিশে গেল। মিলিয়ে গেল।

ওদের কথা মনে পড়লেই তপনের মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কত কথা মনে পড়ে। সেসব কথা চিরদিন মনে পড়বে। 'জান তপন, সেদিন সবাই আমাকে ভালবাসবে, মনে করবে, যেদিন শকুন্তলা আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে চাইবে, ঠিক সেইদিনই আমি চলে যেতে চাই।'

'কি আজে-বাজে কথা বলছেন!'

'আজে বাজে কথা নয় ইয়ংম্যান! ঐভাবে যেতে পারলে আমি মরব না, মরেও চিরকাল বেঁচে থাকব।'

সলিলদার মৃত্যুর খবর পেয়ে তপনের সন্দেহ হয়েছিল, উনি ইচ্ছা করেই বাঁচলেন না? কোর্ট অফ্ এনকোয়ারির রিপোর্ট বেরুলে জানতে পেরেছিল, না, উনি বাঁচার জন্য, শকুন্তলার কাছে ফিরে আসার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন।

নিজের জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে সলিলদার কতকগুলো অদ্ভুত থিওরি ছিল। 'আই নেভার লাইকড্ টু ডাই এ্যাজ এ জুনিয়ার অফিসার। খুব সিনিয়ার অফিসার হয়েও ফ্লাইং এ্যাকসিডেণ্টে মরতে চাই না।'

'কেন?'

'তাহলে লোকে বলবে ফ্লাই করতে শিখিনি অথবা ভুলে গেছি।'

'তাই কি উনি উইং কমাণ্ডার হয়েই চলে গেলেন?'

ভাবতে গেলে মাথাটা ঘুরে ওঠে তপনের। এই ক'বছরে কত পরিচিত, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু হলো। সবার জন্যই দুঃখ হয়, মন খারাপ হয়। কর্মজীবনের তাগিদে, তাড়নায় আস্তে আস্তে ঐসব স্মৃতি চাপা পড়ে। তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। একদিন হয়ত একেবারেই মুছে যাবে কিন্তু সবার কথা কি ভুলে যেতে পারে?

পারে না। চেষ্টা করলেও পারে না ইচ্ছা করলেও পারে না। সলিলদাকে কিছুতেই মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না তপন।

তেজপুরে থাকার সময়ই খুব বেশী করে ঐসব কথা মনে পড়ত। কলকাতায় ইস্টার্ন এয়ার কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্সে বদলী হবার পর নতুন আনন্দে মেতে উঠল। অনেক দিন, অনেক বছর পর নিজের জন্মভূমি কলকাতায় এসে তপন যেন প্রথম যৌবনের রঙীন দিনগুলি ফিরে পেল।

'আচ্ছা সীতা, আদমপুরে তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পরই যদি আমি এখানে বদলী হতাম?' প্রশ্ন করেই ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে সীতার দিকে চেয়ে থাকে।

'তাহলে কি হতো বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'বলে দিতে হবে?'

'হ্যাঁ'

'এয়ার ফোর্স' থেকে তোমাকে বিদায় দিত আর আমাকেও বাবা-মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেন।'

'কেন?'

'কেন তাও বলে দিতে হবে?'

'আমাকে এয়ার ফোর্স ছাড়তে হতো?'

'ছাড়তে হতো না, ছাড়িয়ে দিত।'

'কেন?'

'তখন তুমি কলকাতায় থাকলে অফিস করতে?'

'অফিস করব না কেন?'

'ঘোড়ার ডিম করতে।'

'অফিস না করে কি করতাম?'

'কি আবার করবে? আমাকে পাগল করতে।'

'তখন পাগল করলে বুঝি খুব অন্যায় হতো?'

সীতা বেশ জোর করেই বললো, 'নিশ্চয়ই।'

তপন তাড়াতাড়ি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, তাহলে এখন পাগলামি করলে তো অন্যায় হবে না?'

সীতা তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'অসভ্যতা করলে আমি চিৎকার করব কিন্তু।'

'তুমি চিৎকার না করলেও সবাই জানে তোমার সঙ্গে আমি অসভ্যতা করি।'

লজ্জায় সীতা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'বাপরে বাপ! কি অসভ্য ছেলে!'

'আমি একাই অসভ্য, তাই না?'

'আঃ! চুপ করো তো!'

দিনগুলো কেমন ভাসতে ভাসতে চলে যায়। প্রত্যেক মাসে কোন না কোন উইক-এণ্ড'এ দুর্গাপুর যায়। শান্তিনিকেতন-দীঘাও ঘুরে এসেছে। বাইরে না গেলে ছুটির দিন সারা সকাল-দুপুর মার সঙ্গে গল্প করে। কোন কোন রবিবার সকালের দিকে বাবার ডিসপেনসারী ঘুরে আসে। ছোটবেলায় প্রায় রোজই ও বাবার সঙ্গে ডিসপেনসারী যেত। তখন ওর সখ ছিল ডাক্তার হবে। এ ছাড়াও দু'চারদিন পর পরই বিকেলের দিকে সীতাকে নিয়ে ওর বাবা-মাকে দেখে আসে। মিতুল চলে গিয়ে বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

এর উপর বন্ধুবান্ধব সিনেমা-থিয়েটার এসপ্লানেড-ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল তো আছেই।

সেদিন শনিবার। ইভিনিং শো'র টিকিট কাটা আছে। তপন অফিস থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নেবার পরই ওরা বেরুবে। তারপর মডার্ন টেলসে' প্যান্টের ট্রায়াল দিয়ে সিনেমায় যাবে। আগের থেকেই ঠিক করা আছে।

তপন অফিস থেকে এসে খাওয়া-দাওয়া করে শোবার ঘরে এলো। একটা সিগরেট খাবার পর শুয়ে পড়ল সীতার পাশে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। তপনের ঘুম এসে গেছে। সীতা ওর গায় হাত দিতে দিতে ডাকল, 'ঘুমিয়েছ?'

চোখ বুজেই ও জবাব দিল, 'উঁ হু!'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

'শুনছ!'

'বল।'

'আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।'

'ঘুমোও। ঠিক হয়ে যাবে।'

সীতা তপনের মাথায় হাত দিতে দিতে একটু হাসে। 'অনেক ঘুমিয়েছি।' কথা বললেও তপনের বেশ ঘুম এসে গেছে। 'স্যারিডন খাও।'

সীতা একটু জোরেই হাসে। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ভাবে, এখন বলবে না, পরে বলবে। রাত্রে বলবে। কিন্তু আজ না কাল করতে করতে কিছুতেই বলা হচ্ছে না। না, না, আর দেরী করা ঠিক নয়। তাছাড়া এক্ষুনি ওকে না বলে শান্তি পাচ্ছে না।

'তোমার হাতটা দাও তো।'

হাতটা এগিয়ে না দিয়েই তপন বললো, এই নাও।

সীতা নিজেই ওর হাতটা টেনে নিয়ে নিজের পেটের উপর দিয়ে বললো, একটু হাত দিয়ে দাও তো!

'হাত দিয়ে কি হবে? সোডা খাও।'

সীতা এবার হাসতে হাসতে উঠে পড়ে। ওর মুখের পর মুখ নিয়ে কানে কানে বলে, 'স্যারিডন, সোডা খেয়ে কিছু হবে না। ইউ আর গোয়িং টু বী এ ফাদার।'

তপন চমকে ওঠে, অ্যাঁ!

সীতা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললো, 'এবার একটু সিরিয়াস হও।'

সীতাকে জড়িয়ে ধরে ও জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি বলছ?'

'এ নিয়ে কেউ মিথ্যা বলে?'

'মা জানেন?'

'সন্দেহ করেছেন তবে আমি এখনও কিছু বলিনি।'

'আর কেউ জানে না?'

'আগে তোমাকে না বলে আমি কি ঢাক পেটাব?'

'তাহলে তো আজ দুটো সিনেমা দেখতে হয়।'

'আজ্ঞে না। আমাকে নিয়ে আর অত ঘুরো না।'

'কেন?'

'কেন আবার? আমার মাথা ঘোরে। তাছাড়া হঠাৎ যদি কোথাও বমি-টমি করে ফেলি?'

'বমি করবে কেন?'

সীতা ওকে এক ধাক্কা দিয়ে বললো, 'ইচ্ছে করে করব নাকি? এখন এমনি হয়।'

'রিয়েলি?'

'তুমি কি কিছুই জান না?'

'তুমি না বললে আমি কেমন করে জানব?'

'সব কিছু জানান যায় না।'

তপন দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আব্দার করল, 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে সব কিছু বলবে।'

'যাও মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ভর্তি হও।'

তপন নয়, সীতাকেই ভর্তি হতে হয়েছিল হাসপাতালে। মিলিটারী হাসপাতালে। কয়েক মাস পরে। একা সীতা হাসপাতালে গিয়েছিল কিন্তু ফিরল দুজনে। সীতা মা হলো, তপন বাবা হলো। ঐ ছোট্ট একটা কচি বাচ্চা এসে সারা বাড়ি মাতিয়ে তুলল।

বর্ষার পদ্মার মত জীবনটা যেন মাতলামি, পাগলামি করতে করতে ছুটতে লাগল। নিজের জীবনে, কর্ম জীবনে, জাতির জীবনে। নেফার জঙ্গলে, লাদাকের প্রাণহীন ধূসর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোড় ঘুরল। যে কৃষ্ণ মেননকে নিয়ে সমস্ত জাতি একদিন গর্ব অনুভব করত, সেই কৃষ্ণ মেননকে ব্যর্থ নায়কের মত রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হলো।

তপন স্কোয়াড্রন লীডার হয়ে পালামে বদলি হলো। হান্টার স্কোয়াড্রনের ফ্লাইট কমান্ডার হলো। ছোট্ট বাপ্পাকে নিয়ে সীতা কলকাতায় থাকল।

তোমাকে পাবার ঠিক আগেই আমি ফ্লাইট লেফটন্যান্ট হলাম। পাবার পর পরই বিলেত গেলাম। বাপ্পা আসার সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়াড্রন লীডার হলাম। তুমি এখানে এলেই আমি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে উইং কমান্ডার হবার চেষ্টা করব। তুমি সহযোগিতা করবে তো?'

গ্রুপ ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত তখন এয়ার হেড কোয়ার্টার্সে থাকেন ওয়েলেসলি রোডে। তপন রোজ বিকেলে যায়, ফিরে আসে রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর। সীতাকে চিঠি লিখেই প্রস্তাবটা শান্তা বৌদিকে জানাল। 'তোমার বোন একটু কোয়াপারেট করলেই আমি প্রমোশন পেতে পারি, তাই না?'

শান্তাবৌদি ওকে তেড়ে মারতে গিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ মিতুল ওর কয়েক-

জন বন্ধুকে নিয়ে এসে পড়ায় নিজেকে সামলে নিলেন। তবে ওকে বল্লেন, তুমি কি উইং কমান্ডার হয়েই থামবে? তখন বলবে গ্রুপ ক্যাপ্টেন হবো। তারপর তো আস্তে আস্তে এয়ার চীফ মার্শাল হতে চাইবে।'

'সীতার অনুপ্রেরণা আর ভালবাসায় হতেও পারি, কি বল?'

অনেক কাল পরে শান্তাবৌদিদের কাছে পেয়ে তপনের বেশ লাগে। ওরা না থাকলে দিল্লীতে থাকা সত্যি কষ্টকর হতো। বিশ্বাস আর গিল অনেক আগেই বদলি হয়ে গেছে। চতুর্বেদী আছে, তবে অনেক দূরে থাকে। দেখাশুনা হওয়াই মুস্কিল।

বাপ্পাকে নিয়ে সীতার আসতে আসতে অনেক দেরী হলো। প্রথম কথা বাবা-মা, তার উপর 'দাদা-বৌদি। ওদের এখনও কোন বাচ্চা হলো না। বাপ্পাকে নিয়ে ওরা প্রায় পাগলামি শুরু করে দিয়েছে। কি যে করবে, ভেবে পায় না। এতদিন কলকাতায় কাটিয়ে সীতা আর বাপ্পাকে নিয়ে বৌদি দুর্গাপুর গিয়েছেন। কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না। 'ভাই ঠাকুরপো, আমার উপর রাগ করো না। বাপ্পাকে এত ছোট নিয়ে গেলে সীতার পক্ষে সংসার করা অসম্ভব হবে। আরো দু'এক মাস অন্তত এখানে থাকা দরকার। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারি। তবে তুমি যদি এখনই সীতাকে নিয়ে যেতে চাও তাহলে আমিও মাসখানেকের জন্য আসবো।'

চিঠির তলায় বৌদি একটু ছোট্ট মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন, শুধু বাপ্পাকে সামলালেই তো সীতার চলবে না, তোমাকেও তো সামলাতে হবে! এত তাড়াতাড়ি দুটি খোকাকে খুশী করতে গেলে সীতার সত্যি কষ্ট হবে।'

দুর্গাপুর থেকে সীতাও চিঠি লেখে, 'এখানে বেশ আছি। আমি তোমার বাপ্পাকে পেটে ধরলেও দিদিই যেন ওর আসল মা! দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা দিদি ওকে নিয়ে ব্যস্ত। ওর জন্য উনি কি করছেন তা তুমি না দেখলে কল্পনা করতে পারবে না। বাপ্পাকে নিয়ে আমি আর দিদি বড় বেডরুমে থাকি। রাত্রে পর্যন্ত আমাকে একবার উঠতে হয় না, অথচ প্রত্যেকদিন রাত্রে দিদিকে তিন-চারবার উঠতেই হয়। এই স্টীল টাউনের প্রত্যেকটি পরিচিত বাঙালী অবাঙালীর বাড়িতে গিয়ে দাদা-দিদি বাপ্পাকে দেখিয়েছেন। বাপ্পাকে ছেড়ে ওঁরা যে কিভাবে এখানে থাকবেন, তা ভাবতে গেলেও আমার ভয় করে।'

শেষ পর্যন্ত বাপ্পাকে নিয়ে সীতা যখন এলো, তার এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রুপ ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত এয়ার এ্যাটাশে হয়ে কায়রোয় বদলি হয়ে গেলেন।

॥ বারো ॥

পালাম থেকে স্টাফ কলেজ। ওয়েলিংটন। হান্টারের কক্‌পিট থেকে কলেজের ক্লাশরুম। দিল্লীর রুক্ষতা থেকে দোদাবেত্তা পাহাড়ের নৈসর্গিক সবুজের মেলা।

বাপ্পা আপন মনে ঘুরে বেড়ায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে। লুকোচুরি খেলে। পাতা কুড়োয়। ঢালুর দিকে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে যায়। উঠে পড়ে। আবার দৌড়ায়। সীতার কোলে মাথা দিয়ে স্কোয়াড্রন লীডার তপন সরকার শুয়ে থাকে। গল্প করে। গান শোনে, ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই। ওদিকে কচ্ছ সীমান্তের কাহিনী দুনিয়ার সংবাদ পত্রের শিরোনামা হতে শুরু করেছে।

তপন হালোয়ারায় পৌঁছবার পর বিশেষ দেরি করতে হয়নি। আয়ুব আর ভুট্টো আর সংযত থাকতে পারলেন না। দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা-মত কার্যকরী করতে শুরু করলেন। প্রথম রাতের অন্ধকারে, তারপর প্রকাশ্য দিবালোকে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা দেখা দিল ভারতীয় মহলে। আয়ুব খাঁ বললেন, শ্রীনগরের ডাল লেকের পাড়ে বসে এবার পাকাপাকিভাবে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ণয় করবেন। শাস্ত্রীজি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব শ্রীনগর আসার আগেই এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে কয়েকজন ইণ্ডিয়ান জেনারেল রাওলাপিণ্ডিতে গিয়ে শান্তিতে কফি খেতে পারেন।

আয়ুব-ভুট্টো হাসলেন। নেহেরুহীন ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দেবার নেশায় ওরা তখন মশগুল। ন্যায়-অন্যায় সম্ভব অসম্ভব বিচার করার মত মানসিক ক্ষমতা বা অবস্থা ওরা তখন হারিয়েছেন।

নাটকের দৃশ্য বড় দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হতে লাগল। সকাল-সন্ধ্যায়। তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায়। লেফট্‌ন্যাণ্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছাম্ব-জুরিয়ান সেক্টরে। ঠিক অপ্রত্যাশিত না হলেও ভারতীয় নেতারা আশা করেননি আয়ুব এত বড় ভুল করবেন।

না। আর নয়। জেনারেল চৌধুরীকে শাস্ত্রীজি অর্ডার দিলেন, ইউ আর ফ্রি টু ক্রশ ইণ্টারন্যাশনাল বাউণ্ডারী। এয়ার চীফ্ মার্শাল অর্জুন সিংকে পরিষ্কার বলে দিলেন, স্ট্রাইক! আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য স্ট্রাইক এনিহয়ার।

প্রাইম মিনিস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই চীফ্ অফ্ দি এয়ার স্টাফ একবার ভাল করে, খুব ভাল করে হাতের ঘড়িটা দেখলেন। সূর্য অস্ত যাবার বিশেষ দেরি নেই। অন্ধকার হবার আগেই স্ট্রাইক করে এয়ারক্রাফট্‌দের বেস্' এ ফিরতে হবে। সময় বড় জোর আধ ঘণ্টা।

এক মিনিটের মধ্যে এয়ার হেড কোয়ার্টার্স থেকে কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্সে সিগন্যাল চলে গেল। তিন-চার মিনিটের মধ্যে বেস্ অপস্ থেকে সেই সিগন্যাল ছড়িয়ে পড়ল আম্বালা, পাঠানকোট, হালওয়ারা, আদমপুর।

হালওয়ারার ও-সি ফ্লাইং এক মিনিটের জন্য পাইলটদের ব্রীফ্ করার পর চিৎকার করে বললেন, পুস অফ্ বয়েজ। স্ট্রাইক! স্ট্রাইক এ্যাজ বেস্ট এ্যাজ ইউ ক্যান।

আর ?

আর বললেন, বেস্ট অফ্ লাক।

দশ-পনের সেকেণ্ড পর পর একটা-একটা হাণ্টার লালওয়ারার রানওয়ে থেকে বিদ্যুতবেগে টেক্ অফ্ করল। ডেস্টিনেশন : সারগোদা। স্যাবার জেটের অন্যতম পীঠস্থান সারগোদা!

সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু কংক্রিটের রানওয়েটা তখনও স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গোধূলির মিষ্টি আলোয়। একটার পর একটা হাণ্টার নেমে এলো হালওয়ারার বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যাল চলে গেল বেস্ অপস্'এ—মিশন সাকসেসফুল। অল রিটার্নড্ সেফ।

বেস্ অপস্ থেকে কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্স। কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্স থেকে এয়ার হেড কোয়ার্টার্স। এয়ার চীফ্ মার্শাল সঙ্গে সঙ্গে প্রাইম মিনিস্টারকে জানালেন, রেজাল্টস্ এক্সট্রিমলি এনকারেজিং।

ঠিক ডিক্লেয়াড ওয়ার নয়, তবুও যুদ্ধ। রিয়েল ওয়ার। দুশ্চিন্তায়, আতঙ্কে সীতার হৃৎপিণ্ড যেন মাঝে মাঝেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাপ্পাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে কত কি ভাবতে ভাবতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। অনেক চেষ্টা করেও মাঝে মাঝেই হেরে গেছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে।

'মা তুমি কাঁদছ ?'

সীতা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছে, 'তুমি ঘুমোও।'

বাপ্পা ঘুমোয় না। 'মা, বাপি লড়াই করতে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'মা, বাপির মত আমাকে একটা প্লেন কিনে দেবে ? আমিও লড়াই করব।'

সীতা ভয়ে শুকিয়ে যায় ছেলের কথা শুনে। 'না, তুমি লড়াই করবে না। তুমি দাদুর মত ডাক্তার হবে।'

'কেন ? আমি দুম্‌দুম্ করে গুলি চালিয়ে লড়াই করব।'

সীতা আর সহ্য করতে পারে না। ছেলের উপর রাগ হয়, রেগে যায়। 'আঃ! চুপ কর।'

ছোট্ট, অবোধ, অবুঝ বাপ্পাও বুঝতে পারে মা পাল্টে গেছে। মুখে সেই হাসি নেই, গুণ গুণ করে গান গায় না। মার সঙ্গে কথা বলতেও ভয় করে। ও চুপ করে। আর কথা বলে না। বলতে সাহস হয় না, ইচ্ছা করে না।

তারপর একদিন আর ঘন ঘন সাইরেন বাজে না। ব্ল্যাক-আউট উঠে যায়। হালওয়ারার পুরানো দিনের শান্তি ফিরে আসে।

কিন্তু ?

কিন্তু কি ? শহরে-নগরে ঘরবাড়িতে আলো জ্বলে উঠলেও বহু সৈনিক, বহু বৈমানিকের সংসারের মনের আলো চিরদিনের মত, চিরকালের জন্য নিভে

যায়। ফ্লাইট লেফট্‌ন্যান্ট ল্‌থেরার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী উষার জীবনের শ্‌র্‌তেই রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো। গিল কাস্‌র এয়ারফিল্ডের কণ্ট্রোল টাওয়ার বম্বিং করে ফেরার পথে ওর ক্যানবেরায় রকেট হিট্‌ করে। একটু পরেই এয়ারক্রাফটে আগ্‌ন লেগে যায়। গিল বাধ্য হয়ে 'বেল আউট' করে। সে এখন পাকিস্তানের য্‌দ্ধ বন্দী শিবিরে প্রমীলার কথা ভাবছে।

পাকিস্তান হারল কিন্তু ঠিক যতটা বিটিং দেওয়া দরকার ছিল, তা সম্ভব হলো না! ওদের ওয়ার-মেসিনারী, য্‌দ্ধযন্ত্র যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পঙ্গ্‌ হলো না।

'আরো কয়েকদিন য্‌দ্ধ চললে ওদের একেবারে ফিনিস করে দেওয়া যেতো।'

তপনের কথায় সীতা যেন দপ্‌ করে জ্‌লে ওঠে. 'থাক, থাক, অনেক হয়েছে। আর দরকার নেই।'

আপন মনে খেলা করতে করতে বাপ্পা হঠাৎ উঠে এসে তপনকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'জান বাপি. তুমি যখন য্‌দ্ধ করতে মা তখন কাঁদত।'

একবার সীতার দিকে চেয়ে বাপ্পাকে ব্‌কের মধ্যে টেনে নিয়ে তপন বললো, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। রোজ কাঁদত। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত।'

ডাইনিং টেবিলে সাজাতে সাজাতে সীতা বকে উঠল. চ্‌প কর। এই ছেলেটা বড্ড বকাটে হয়েছে।'

আস্তে আস্তে আবার সব কিছ্‌ সহজ. সরল, স্বাভাবিক হয়ে আসে। গিল ফিরে আসে। সীতা বাপ্পাকে আর বকে না। হাসে। গ্‌ণ গ্‌ণ করে গান গায়।

হালওয়ারা থেকে এয়ার হেড কোয়ার্টার্স। এয়ার হেড কোয়ার্টার্স থেকে প্‌ণা। প্‌ণা থেকে আম্বালা। জীবন এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাকিস্তানের ইতিহাস। বাপ্পা বড় হয়। এয়ার ফোর্স স্কুলে পড়ে। তামসীর মেয়ে দ্‌টো দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। গিলের ছেলেটা কি ভীষণ দ্‌রন্তই হয়েছে। বাপরে বাপ! প্রমীলা হাঁপিয়ে যায় ওকে সামলাতে। চতুর্বেদীর স্ত্রীর ইউট্রাসে ক্যান্সার হয়ে অপারেশন হয়েছে কিন্তু এখনও হাসপাতালে পড়ে আছে।

আরো কত কি হলো। ডাঃ সরকার প্র্যাকটিশ করা ছেড়ে দিয়েছেন। তপনের দাদা দ্‌র্গাপ্‌রের চাকরি ছেড়ে বাবার ডিসপেন্সারীতে বসছেন। তবে আজও বৌদির কোন বাচ্চা হলো না। মনে হয় হবেও না। ছ্‌টি হলেই বাপ্পা ওর কাছে যাবে। যাবেই। বড়মা'র কাছে না গেলে ওর ঠিক ভাল লাগে না। দাদা-দিদি দাদ্‌-দিদার চাইতে বড়মা'র কাছেই ওর বেশী আবদার। কেউ কিছ্‌ বললেই বৌদি রেগে যান. বাপ্পাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে বসেন। বাচ্চা-কাচ্চা

হয়নি বলে যদি হঠাৎ কেউ কিছু বলেন, তাহলেই উনি বললেন, 'হ্যাঁরে বাপ্পা! তুই আমার ছেলে না?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি তোর কে রে?'

'কে আবার? মা, বড়মা। অনেক বড়মা।'

'আমি মরে গেলে তুই কাঁদবি?'

'তুমি মরবেই না।'

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পাড়ে আস্তে আস্তে ঘন কালো মেঘ জমতে শুরু করে। রমনার মাঠে মুজিবের কণ্ঠে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে চমকে দেয় সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। ঘুম ভাঙে না শুধু রাওলাপিণ্ডির অচলায়তনের মুষ্টিমেয় মূর্খ, অজ্ঞান নায়কদের।

তারপর?

ইতিহাস মোড় ঘুরল। একেবারে এ্যাবাউট টার্ন। অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের মত এক সঙ্গে গর্জে উঠল সাড়ে সাত কোটি অসহায়, বুভুক্ষু মানুষ। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য নয়, শুধু প্রাণ, শুধু সম্মান বাঁচাবার তাগিতে এক কোটি মেয়ে-পুরুষ আশ্রয় নিল ভারতের মাটিতে।'

আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ-উপরোধ করেও ফল হলো না। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর জল নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক বাঙালীর রক্তে লাল হলো। বাঙ্কারের অন্ধকারে, কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের হারেমে বিংশ শতাব্দীর সব চাইতে অন্ধকারময় ইতিহাস রচিত হলো।

তবুও রাওলাপিণ্ডির সমর- নায়কদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হলো না। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করল।

যুদ্ধ!

আবার যুদ্ধ! ব্ল্যাক আউট! সাইরেন!

এমন সম্ভাবনার জন্য ভারত প্রস্তুত ছিল। প্রাইম মিনিস্টার আগেই ক্লিয়ার কাট অর্ডার দিয়ে রেখেছিলেন। প্রয়োজন হলে ফাইট -। ফাইট টু ফিনিশ।

হান্টার ন্যাট, মিগ! এমন কি ক্যানবেরা পর্যন্ত আকাশে উড়ল। ইনজিওর্ড কোবরা আর হাফ-ফিনিশড্ ওয়ার রাখতে নেই কিন্তু আগের বার অর্ধেক যুদ্ধ লড়ার পরই বন্ধ করতে হয়। এবার আর নয়। ফাইট টু ফিনিশ। ফিনিশ পাকিস্তানের ওয়ার-মেসিনারী।

উইং কমাণ্ডার তপন সরকার কাসুর এয়ার-ফিল্ডের উপর দুটো স্যাবার ধ্বংস করে ফিরে আসতেই আম্বালা এয়ার ফোর্স স্টেশনে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুধু করাচী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্তই নয়, টোকিও থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত চমকে গেল ভারতীয় স্থল-নৌ-বিমান বাহিনীর কৃতিত্বে।

দুর্ভেদ্য যশোর ক্যান্টনমেন্ট খালি করে রাতের অন্ধকারের নিয়াজির বীর সেনাবাহিনী পালাল। আখোরায় পতন হলো। চাঁদপুর হাতে এলো। টাঙ্গাইলে প্যারাট্রুপার ল্যান্ড করল।

স্নান করে সিঁদুর পরার সময় হঠাৎ সীতার হাত থেকে সিঁদুরের কৌটোটা পড়ে গেল। সীতা উন্মাদের মত চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রমনার মাঠে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করলেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী হেসে উঠল। বিতাড়িত এক কোটি বাঙালী ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু সীতার কান্না থামল না। থামবে না। উইং কমান্ডার তপন সরকার আর কোনদিন ঘরে ফিরবে না।

সে নেই।